বাঙলা সাহিত্যে

বাঙলার খেলোয়াড়দের দুঃখ সুখের সর্বপ্রথম সমব্যথী

শ্রী মতি নন্দী'কে

প্রথম প্রচ্ছদ : এঁকেছেন চিত্রশিল্পী শ্রী প্রকাশ কর্মকার।

শেষ প্রচ্ছদ : সত্তরের ওয়ার্ল্ড কাপ সেমিফাইনালে ইতালির বিরুদ্ধে পঃ জার্মানির তৃতীয় গোলের দৃশ্য। হায়! হায়! করছেন ইতালির গোলকীপার অ্যালবার্তোসি। সতীর্থ রিভেরা আফশোষে বারপোস্টে মাথা ঠুকছেন। গোল করে বেতাল হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন পঃ জার্মানির জার্ড মুলার।

মধ্যবিত্ত ঘরের যুবক হয়েও 'একা লড়ে যাওয়ার' যুক্তিটি আমার ভাল লাগে না। সদ্য সমাপ্ত সত্তরের ওয়ার্ল্ড কাপে ব্রাজিল টিমে দলগত প্রভাবের চেয়ে ব্যক্তিগত ভূমিকার প্রাবল্যের জয়জয়কার জেনেও আমার একান্ত বাস্তববাদী 'টিম 'এফ্‌ফার্ট' সিদ্ধান্তটিকে বিসর্জন দিতে রাজি নই। এই 'ওয়ার্ল্ড-কাপ' বইটিও সেই ঐকতানের দ্রুততম ফসল।

এই সত্তরেই প্রথম প্রেরণা পাই সাহিত্যিক শ্রী অমরেন্দ্র কুমার সেন এর কাছ থেকে। প্রেরণার ফুটবলটি নিয়ে কিছু সময় 'ড্রিবলিং' শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম—লিখবই। যদিও জানতাম স্থান, কাল, চরিত্র ওই তিনটি প্রসঙ্গের মধ্যে প্রথম ও শেষ প্রসঙ্গটির সঙ্গে আমার পরিচয় সামান্যই। খানিকটা দ্বিধার সঙ্গে কাজ শুরু করেছি। দ্বিধা কাটিয়ে উঠেছি শ্রী মতি নন্দী'র অফুরন্ত উৎসাহ ও নানাবিধ সহযোগিতায়। বিশ্ববাণী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী শ্রীব্রজকিশোর মণ্ডল বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ায় আমার ঋণ আরও বেড়েছে। সবশেষে অধমর্ণের দায়ে জড়িয়ে পড়েছি সাংবাদিক শ্রী ব্রজরঞ্জন রায় শ্রী অজয় বসু এবং আনন্দবাজার পত্রিকা'র কাছেও।

এত ঋণ মাথায় নিলাম শুধু বাংলা দেশের ফুটবল পাঠকদের মুখ চেয়ে। ভারতীয় হিসাবে দুঃখ চল্লিশ বছরের ওয়ার্ল্ড কাপে অগণিত ফুটবল অ্যাথলীটদের ভিড়ে একটিও ভারতীয় মুখ দেখতে পেলাম না। একমাত্র সান্ত্বনা এই বইটি ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের সম্পূর্ণ ছবির বাঙলা প্রতিচ্ছবি। যদি সংঘবদ্ধ প্রতিফলন সার্থক হয়ে থাকে—তবে বুঝব গোল হয়েছে।

ওয়াল্ড কাপ ১৯৩০—৩৮ ফুটবল

কাঞ্চন-পরী জুল রিমের জন্ম-লগ্ন

ফুটবল খেলার অন্যতম প্রধান হোতা ইংল্যাণ্ডের ক্রীড়ামহলে বিশ্ব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপকে বলে ওয়ার্ল্ড কাপ। অন্য সব দেশে ওই বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতার নাম ওয়ার্ল্ড সকার চ্যামপিয়নশিপ। সাধারণতঃ খেলা হয় লীগ ও নকআউটের ভিত্তিতে। তবে লীগ পদ্ধতিরই পর্যায় বেশী জায়গা জুড়ে আছে। ফাইনাল খেলা হয় চার বছর অন্তর। ফাইনাল পবের দিকে খেলাগুলো যতই এগোতে থাকে ততোই, যে টিম হারবে সে সরে দাঁড়াবে, এই ভাবে নকআউট পদ্ধতিতে ম্যাচগুলো দ্রুত শেষ হয়ে আসে।

১৯৩০ সালে ওয়ার্ল্ড কাপের প্রথম অনুষ্ঠানে খেলা হয়েছিল চারটি পুলে, প্রথম পুলে ছিল চারটি টিম এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পুলে টিমের সংখ্যা ছিল তিন করে। পুলের মধ্যে খেলাগুলি হয়েছিল লীগ পদ্ধতিতে। নকআউট পদ্ধতি চলে সেমিফাইনাল পর্যায়ের পরে। মাঝে ইউরোপীয় অঞ্চলে ইংল্যাণ্ডকে একটি গ্রুপ ধরে নিয়ে মোট ভাগ করা হয়েছিল ৯টি গ্রুপে। পরবর্তীকালে উত্তর দক্ষিণ ও লাতিন আমেরিকা অঞ্চলকে এবং মেক্সিকোকে একটি আলাদা গ্রুপ ধরে ১৪টি গ্রুপ করা হয়—আগের ৯টি ও পরে আমেরিকা মহাদেশ, এশিয়া, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়াকে নিয়ে ৫টি গ্রুপ মিলে। ১৩ নম্বর গ্রুপকে টুকরো করে করা হয়েছে তিনটি সাব গ্রুপে। ফুটবলের বিশ্ব কাপ প্রতিযোগিতার এই হল আঞ্চলিক ভাগ।

কিন্তু বিশ্ব কাপ খেলায় ওইসব অনেক রকমের অঙ্কের ব্যাপার থাকলেও বা এতবড় আয়োজন উনিশশো ত্রিশ সালে আরম্ভ হলেও প্রথম দিকে বিশ্বের এই সেরা ট্রফির কি নাম দেওয়া হবে তা নিয়ে সময় খরচ হয়েছে প্রচুর।

বিশ্ব কাপ পরিচালকদের প্রাথমিক দুশ্চিন্তা ছিল কি ভাবে এতবড় ফুটবল যুদ্ধ ভালভাবে চালিয়ে যাওয়া যায়। ওঁদের ওই উদ্বিগ্নতাকে আনকোরা দম্পতির বংশবৃদ্ধির সমস্যার মত মনে হয়েছে। তাদের যে সন্তান আসছে তার কি নাম দেওয়া হবে এ যেন তারই উসখুস্থুনি।

ফিফা'র (ফেডারেশন অব ইণ্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসো-সিয়েশন) সদস্যরা এর উপর প্রচণ্ড আলোচনা করেছেন। ১৯২০ ও ২৪'এর ওলিম্পিক গেমসেব নির্ঝঞ্চাট অনুষ্ঠানে ওঁরা বুকে বল পেলেন। ১৯২৮'এর আমস্টার্ডাম ওলিম্পিকের সময় স্পোর্টস সম্মেলনে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলে। তার দু বছর বাদে ঠিক হয় "অ্যাসোসিয়েশন-স্বীকৃত দেশগুলোর মধ্যে ফুটবলের একটি প্রতিযোগিতা হবে", কিন্তু এই পাকা কথার সঙ্গে কোন 'কাপ' বা চ্যাম্পিয়নশিপ সম্পর্কে টুঁ-হঁ্যা করা হয়নি। এটা হয়তো নেহাতই কূটনৈতিক উদাসীনতা!

১৯৩০এর প্রথম অনুষ্ঠানের পর এই প্রতিযেগিতাকে বলত লা ক্যু দ্য মঁদে। কয়েকটি দেশের অভিমত ছিল, এই খেলার নাম ওয়ার্ল্ড সকার চ্যামপিয়নশিপ রাখা হোক। ১৯৩৮'এ ফ্রান্সে যখন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল তখন তার পুরানো নামই রয়ে গেছে।

১৯৫০ ও '৫৪তে ব্রাজিল ও সুইজারল্যাণ্ড টুর্নামেণ্টটিকে ফ্রান্সে জুল রিমে কাপ নামে পরিচয় দেওয়ায় আসল নাম ওয়ার্ল্ড কাপ বস্তুতঃ পরিণত হল দ্বিতীয় শিরোনামে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে লুক্সেমবার্গে যেসব প্রতিনিধি দল জড়ো হয়েছিল তারা তৎকালীন

ওয়ার্ল্ড কাপ সংস্থার সভাপতি ফরাসী আইনজ্ঞ জুল রিমের সভাপতি পঁচিশতম বার্ষিক উৎসব স্মরণে ঠিক করল বিশ্বকাপের আর এক নাম হবে জুল রিমে কাপ। কর্মকর্তাদের মনোগত ইচ্ছাটি খুব শিগগিরই রূপ নিল। সমস্ত জল্পনার নিরসন হল ১৯৫৪-এর ওয়ার্ল্ড কাপ অনুষ্ঠানের পরে। ঝানু আইনজ্ঞ জুল রিমে নিজেই বিধান দিলেন; "ভবিষ্যতে দ্বিতীয় নাম জুল রিমে কাপসহ এর পরিচয় হবে" বিশ্বের ফুটবল চ্যাম্পপিয়নশিপ; তবে এর জুল রিমে নামটাও আমার ভাল লাগে।

অত দিন পরেও ওর ভাল-লাগা নিয়ে সরস আলোচনা হলেও বিশ্ব কাপের খেলার বর্তমান রূপ নিতে প্রচুর সময় লেগেছে। ১৯০৪ সালে ২১শে মে প্যারিসে ফিফার উদ্বোধনী সভায় এ বিষয়ে কথা উঠলে বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি ছ'টি প্রতিষ্ঠাতা-দেশের সদস্যরা ফিফা'র সংবিধানে একটি ব্যবস্থা সংযোজন করেন—অ্যাসোসিয়েশনেরই কেবলমাত্র বিশ্ব চ্যাম্পপিয়নশিপ সংগঠনের অধিকার আছে।

ফুটবলের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জন্ম হল। তারপর কেটে গেল ছাব্বিশটি বছর। মাঝে মাঝে এ নিয়ে কথা চললেও ১৯২৮-এ আমস্টার্ডাম ওলিম্পিক গেমসের আগে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। ওইখানেই ১৯৩০এর বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি নিয়ে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

উরুগুয়ের উঠানে প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপ

সে সময়ে উরুগুয়ে তাদের স্বাধীনতার একশো বছরের অনুষ্ঠান করছিল। তাদের উপরই প্রথম আয়োজন উদ্যোগের ভার পড়ে। এই স্থান নির্বাচনের ফলে ইউরোপের বহু দেশের গোঁসা হল। চারিদিকে শুরু হল বয়কট। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছয় যে

আমেরিকা ভয় দেখাতে থাকে তারা ফিফা'র সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবে এবং গড়ে তুলবে এক নিজস্ব সংস্থা। যখন দেখা গেল, প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার জন্য সমবেত তেরটি দলের মধ্যে ইউরোপের চারটি দলও রয়েছে তখনই এই গোলমালের অবসান ঘটল। উপস্থিত ওই চারটি দেশ : বেলজিয়াম, ফ্রান্স, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া।

তখনকার দিনে উরুগুয়েতে যাতায়াতের পথ ছিল দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর সমুদ্রসঙ্কুল। সেই ১৯৩০ সালে জেটের ব্যবস্থাও ছিল না। এই সুদূর দেশে যাওয়াটাই বহু ইউরোপীয়ের কাছে ছিল ভয়ের কারণ। নিঃসন্দেহে ওই দেশে যাওয়া ছিল রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

যদিও প্রতিযোগিতার সমূহ ব্যয়ভার বহনের দায় পড়ল উরুগুয়ের উপরে, তবু ইউরোপের দেশগুলোর খেলোয়াড়ের ভাবনা, এই টানা দশ সপ্তাহের ধকল সয়ে ওখানে যাওয়া কম কথা নয়। ইউরোপের যেসব ক্লাবের খেলোয়াড়েরা যোগ দিচ্ছিল তারাও ভাবল, নামকরা খেলোয়াড়রা ছাড়া খেলা দেখতে দর্শকরা নিশ্চয়ই ভিড় জমাবে না। ফলে তাদের আর্থিক ক্ষতি অনিবার্য। সে ক্ষতি কার ঘাড়ে চাপবে?

উনিশশো তিরিশের স্মরণীয় সেই তেরই জুলাই

রবিবার ১৩ই জুলাই, ১৯৩০ তারিখটি খেলার ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। ওই তারিখেই উরুগুয়ে মন্টিভিডিওতে বিশ্ব কাপ প্রতিযোগিতায় বলে প্রথম লাথি মারা হয় সেদিন মেক্সিকো এমন একটি দেশের বিরুদ্ধে খেলতে নামল যাদের মাটিতে ওই প্রতিযোগিতার প্রসঙ্গে প্রথম কথাবার্তা হয়েছিল। দেশটি হল ফ্রান্স। ফ্রান্সের সঙ্গে মেক্সিকো সাবেকী পদ্ধতিতে ফুটবল খেলেছে. এবং ফ্রান্স তাদের গোলকীপার থিপো ছাড়াই সত্তর মিনিট

যুঝে ফলাফল গড়েছে ৪-১। ফ্রান্সের খেলায়ও ততটা সংঘবদ্ধতার ছবি ফুটে ওঠেনি।

ফ্রান্সের পরের ম্যাচে দশ মিনিটের মধ্যে আউটসাইড লেফ্ট লর্‌ঁত আহত হয়। আশি মিনিট পর একটি গোল খেয়ে ফ্রান্স একটি অসাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রতিযোগিতায় হার স্বীকার করে। ছিয়াশি মিনিটের মাথায় খেলা শেষের বাঁশি বাজার সামান্য পরেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল—দর্শকরা রেফারি অ্যালমিডো বেগোকে বোঝাতে চেষ্টা করছে আরও নাকি পাঁচ মিনিট খেলার সময় বাকি ছিল। সবশেষে দর্শকদের মতামতের কাছে তিনি নতি স্বীকার করেন। ততক্ষণে পনের মিনিট কেটে গেল। তবু দুটি টিমকেই আবার ডাকা হল খেলা শেষ করার জন্যে। স্নায়ুর কামড়ে আর্জেন্টিনার চেরো এত উত্তেজিত হয় যে সে আনন্দের আতিশয্যে অবসন্ন হয়ে পড়ে। তখন সারা মাঠে দর্শকের জয়োল্লাস। দর্শকরা গোলকীপার থিপোকে কাঁধে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে দেখে রেফারি তার ভুলটি ধরতে পারে। ঘোড়সওয়ারি সেপাইরা তখনি মাঠ থেকে দর্শকদের হটিয়ে দেয়।

যেভাবেই হোক প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপ কতকগুলো আশ্চর্য ঘটনার জন্ম দিয়েছে। আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকোর খেলায় হয়েছিল পাঁচটি পেনাল্টি কিক্। আর সব ম্যাচে বীরোচিত চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও এ খেলায় যা হয়েছিল তাকে সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকেও ঘটনা বলা যেতে পারে। প্রতিযোগিতার জন্যে তৈরি হলেও "সেন্টিনারি স্টেডিয়াম" প্রথম খেলার জন্যে প্রস্তুত করা যায়নি। তবু ১৮ই জুলাই পেরুর বিরুদ্ধে উরুগুয়ে'র খেলায় স্টেডিয়ামের ব্যবস্থা পাকা হয়ে যায়। ওইদিন উরুগুয়ের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পাকাপাকি-ভাবে প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপের উদ্বোধন ঘোষণা করলে, স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশের মাঝে ইউরোপীয়েরা তাদের ভুল শুধরে নেয়। শেষে তারা অভিনন্দনে অভিভূত হয়ে পড়ে।

গ্রুপের খেলায় জিতে চারটি ইউরোপীয় দেশের মধ্যে একমাত্র যুগোশ্লাভিয়াই সেমিফাইনালে ওঠে। ফ্রান্স মেক্সিকোর বিরুদ্ধে জেতার পরে হারে আর্জেন্টিনা ও চিলির কাছে। উরুগুয়ের টপাটপ জয়ের নজিরের সঙ্গে রুমানিয়া এঁটে উঠতে পারে না। বেলজিয়ামও পারেনি প্যারাগুয়ে'ব গোলে একটাও বল ঢোকাতে। অবিশ্বাস্য হলেও আমেবিকা যুক্তবাষ্ট্র দুটো ম্যাচেই জিতেছে ৩-০ গোলে।

মাজলির মন্দ ভাগ্য

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্যযে, দক্ষিণ আমেবিকাব টিমগুলো যেভাবে এই বড় অনুষ্ঠানেব জন্য তৈবি হযেছিল তাও এক অভাবনীয় ব্যাপার। টুর্নামেণ্ট আরম্ভ হওয়ার বেশ কযেক সপ্তাহ আগে থেকেই তারা খেলোয়াড়দের ট্রেনিং ক্যাম্প শুরু কবেছিল। সেখানে নিয়ম-নীতিও ছিল খুব কড়া। আগেব দুটো ওলিম্পিকে স্বর্ণপদক পাওয়া উরুগুয়ের মাজালি একদিন তাব বন্ধুর বাড়ি থেকে গভীর রাতে ফেরার সময় ক্যাম্পেব কোচ ওকে দেখতে পায়। এর পরেই মাজালিকে টিম থেকে বরখাস্ত করা হয়—প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপে তার আর খেলা হলনা।

উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনা অক্লেশে সেমিফাইনাল জেতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন ঝাঁজ ছিল না। অবশেষে আকাঙ্ক্ষিত ফাইনালেব মঞ্চটি প্রতিবেশী দক্ষিণ আমেবিকানদের জন্যে প্রস্তুত হয়েছে।

/ম্যাচ দেখতে এসেছিল ৯০,০০০ এবও বেশি দর্শক।

উরুগুয়ের হ্যাটট্রিক

উগ্র সমর্থকরা চুপচাপ থাকতে না পারায় ফাইনাল খেলাটি হল দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ, আনন্দদায়ক, সর্বোপরি হয়ে রইল খেলোয়াড়োচিত ফুটবলের নমুনা।

উরুগুয়ে প্রথমে এগিয়ে গেলেও বিরতির সময় আর্জেন্টিনা ফলাফল সমান করে আর একটি গোল উপরি চাপিয়ে এগিয়ে যায় ২-১এর ব্যবধানে। তারপর দ্বিতীয়ার্ধে তিনবার গোল করে ট্রফিটির প্রথম রক্ষক হিসাবে উরুগুয়ে বিজয়ী হয় ৪-২ গোলে। উরুগুয়ের জয়লাভের মধ্যে দিয়ে প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপ শেষ হল।

আধুনিক খেলার অগ্রগতির দিক থেকেও এটি ছিল যথেষ্ট চটকদার। প্রায় প্রতিটি খেলায় চার গোলের গড় হিসাবে আঠারটি খেলায় গোল হয়েছিল সত্তরটি।

ওয়ার্ল্ড কাপের ফাইনালের তিন বছর আগে আমস্টার্ডাম ওলিম্পকে ওই দুই দলই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল। খেলা অতিরিক্ত সময় গড়ালেও কোন দেশ জিততে পারেনা, আবার তাদের খেলতে হয়।

তবে ওয়ার্ল্ড কাপের প্রথম ফাইনালের দিন উরুগুয়ে ভালই খেলেছে। সাঁইত্রিশ মিনিটের মাথায় আর্জেন্টিনা গোল করলে ওরা খুবই মুষড়ে পড়ে।' 'পরে অবস্থা আয়ত্তে এনে তাদের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি অর্জন করে। পরপর দুটি ওলিম্পিকে ফুটবল বিজয়ী হওয়া এবং তারপর প্রথম বিশ্বকাপ জেতা—নিঃসন্দেহ এটি ছিল হ্যাটট্রিক।

উরুগুয়ের পাল্টা জবাব

ইতালিকে আমন্ত্রণকারী দেশ হিসাবে ধরে ১৯৩৪'এর প্রতিযোগিতা ইউরোপে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ঠিক হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উরুগুয়ে তার পূর্ববর্তী বিজয়ী আখ্যা অটুট রাখার জন্যে ইউরোপে যেতে চাইল না। যেহেতু ১৯৩০'এর অনুষ্ঠানে ইউরোপের দেশগুলো বয়কটের চেষ্টা করেছিল সেহেতু উরুগুয়ে পাল্টা জবাব হিসাবে নিজেদের অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করল। যাহোক সরাসরি নক-আউট রীতিতে খেলা হবে বলে ঠিক হওয়ায় যোগ দিল আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও যুক্তরাষ্ট্র,—এই তিনটি দেশ। এদের নিয়ে যোগদানকারী দেশের সংখ্যা হল যোলো।

ইতালিতে দ্বিতীয় বিশ্বকাপের খেলার আয়োজন করতে যেসব অসুবিধা দেখা দিয়েছিল তা এবারে সরে গেল। ইউরোপের টিমগুলোর পক্ষে কোন অসুবিধাই ছিল না। মুসোলিনীর রাজত্বে ইতালিকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সম্পূর্ণ সুবিধাজনক পরিবেশে আরম্ভ হ'ল দ্বিতীয় বিশ্বকাপের খেলা। এই প্রতিযোগিতায় আমেরিকা মোটেই সুবিধা করতে পারেনি।

ইতালির মুখোমুখি হয়ে শোচনীয়ভাবে ৭-১ গোলে পর্যুদস্ত হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। আর্জেন্টিনা প্রথমে গোল করেও ৩-২ গোলে হেরেছে সুইডেনের কাছে। ব্রাজিল কিছু ব্যক্তিগত উৎকর্ষের ছোঁয়াচ রেখেও স্পেনের কাছে হারে ৩-১ গোলে। এমনকি তারা একটা পেনাল্টি কিক্‌ও ফসকেছিল।

অস্ট্রিয়া সেই সময় নামী খেলোয়াড়ের ফুটবল টিম বলে গণ্য হলেও তাদের প্রথম রাউণ্ডে প্রচণ্ড রকম যুঝতে হল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। সূচনায় ফ্রান্সের সেণ্টার ফরোয়ার্ড নিছক যাত্রীর ভূমিকা নিলেও ফ্রান্সই করে প্রথম গোল। অস্ট্রিয়া ফলাফল সমান পর্যায়ে টেনে

তোলায় অতিরিক্ত সময়ও খেলানো হল। শেষে অষ্ট্রিয়া জিতল ৩-২ গোলে।

বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে জার্মানি ১-২ গোলে পিছিয়ে থাকায় প্রথম দিকে বিচলিত হলেও পরে দারুণভাবে খেলে শেষে ৫-২ গোলে জেতে।

অবিস্মরণীয় গোলকীপার রামোন জামোরা

কোয়ার্টার ফাইনালে সবচেয়ে জোরালো খেলা হয়েছিল ইতালি ও স্পেনের মধ্যে। স্পেনের খেলোয়াড় ফুলব্যাক কুইম কোকেজ ও অবিস্মরণীয় গোলকীপার রামোন জামোরা ছিলেন রক্ষণভাগের দুই আজব খেলোয়াড়। আগে ওরা দুজনেই বহু টিমকে রুখেছিল। এবার করল তারই পুনরাবৃত্তি। ইতালির ফরোয়ার্ডদের বিশ্রী ধরনের পা ছোঁড়াছুড়ি সত্ত্বেও জামোরা তাঁর জীবনের সেরা খেলা খেলেছে। একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে প্রথমার্ধে ইটালি ষোলটি কর্ণার পেলেও জামোরার দুর্গে ফাটল ধরেনি।

সবশেষে জামোরা হার স্বীকার করায় ফলাফল দাঁড়ায় ১—১। খেলানো হয় অতিরিক্ত সময়। তাতেও গোল না হলে আবার খেলানো হয় পরের দিন। অসুস্থ হওয়ায় জামোবা খেলতে নামলেন না। একটি গোল করে ইতালি জিতে যায়।

ইতালির এই জয়ের কথায় ইতালি টিমে বিদেশী খেলোয়াড় নেওয়ার প্রবণতার কথাও এসে পড়ল। তবে ইতালি বিশ্ব কাপের আগে থেকেই ভাড়াটে প্লেয়ার সংগ্রহের দিকে ঝুঁকেছে। আর্জেন্টিনা-জাত আউট সাইড লেফ্‌ট ওরসি ও সেণ্টার হাফ মস্তির নামই সবিশেষ উল্লেখ্য, এঁরা দুজনেই ইতালির হয়ে খেলেছেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টিমেও নেপলসজাত সেণ্টার ফরোয়ার্ড ডোনেলি খেলেছেন। ফলে তিনি পেয়েছিলেন আমেরিকা ও

ইতালি দুই দেশের নাগরিকত্ব। এজন্যে এক সাংবাদিক মন্তব্য করেছিলেন, "অবশেষে একজন সত্যিকারের নেপোলিটানো নেপলসের দলে খেলছে"। কারণ নেপলসের অন্য সব খেলোয়াড়েরা এসেছিল ইতালি থেকে।

ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মত দুই পুরানো প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুকরণে অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরিও দুই সাবেকী প্রতিযোগী খেলতে নেমেছে। এই দুই টিম সম্বন্ধে যেমন ভাবা হয়েছিল তেমনি দ্বিতীয়ার্ধের এক সময়ে অষ্ট্রিয়া ২-০ গোলে এগিয়ে রয়েছে ; এমনি অবস্থায় হাঙ্গেরিকে পেনাল্টি দেওয়া হতেই প্রতিযোগিতায় ঘটল বিস্ফোরণ। এ থেকে গোল হয়েছে। মনে হল হাঙ্গেরি যেন তুঙ্গে। তখন তাদের একটি ফরোয়ার্ডকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়। যার দরুন অষ্ট্রিয়া ২-১ গোলে জয় লাভ করে।

এদিকে ২-১ গোলে সুইডেনকে হারিয়ে জার্মানি সেমিফাইনালে উঠলেও খেলাটিতে ততো তেজ ছিল না। চেকোশ্লোভাকিয়া সুইজারল্যাণ্ডকে হারায় ৩-২ গোলে কিন্তু খেলায় ছিল প্রবল উত্তেজনা। দুটো টিমই খেলেছে চমৎকার। সুইজারল্যাণ্ড প্রথমে গোল করলেও চেকোশ্লোভাকিয়া তা পরিশোধ করে বিরতির আগেই। হাফটাইমের খানিক পরেই চেকোশ্লোভাকিয়া এগিয়ে যায়। এতেই ইঙ্গিত থাকল যে সুইস টিম এবার জান দিয়ে খেলবে।

রূপকথার নায়ক গোলকীপার দলের অধিনায়ক প্ল্যানিকার অসাধারণ গোল বাঁচানোর দক্ষতা বিপক্ষকে ঠাণ্ডা করে রাখলেও শেষ পর্যন্ত তিনি সুইজারল্যাণ্ডের গোল শোধ দেওয়া থেকে আটকাতে পারল না। এর পরেই চেক দল পুনরুজ্জীবিত হয়ে প্রায় শেষ মুহূর্তে জয়ের গোলটি করে ফেলে।

সেমিফাইনালে অস্ট্রিয়ার প্লেয়ারদের ধ্রুপদীর ঢঙের ফুটবল মিলানের বিপর্যয়ের পাঁক থেকে উঠতে না পারায় ইতালি মাত্র এক গোল করে পৌঁছয় ফাইনালে। এর মাঝে রোমে চেকোশ্লোভাকিয়া

জার্মানিকে হারানোর ফলে, চার বছর আগে আমন্ত্রণকারী দেশ উরুগুয়ে যেমন ফাইনালে উঠেছিল এবারও তেমনি আমন্ত্রণকারী দেশ ইতালি ফাইনালে উঠল ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে খেলা পড়ল।

ফাইনালের জমজমাট প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ছুটো টিমই ভাল খেলায় ফাইনাল বেশ জমে ওঠে। চেকোশ্লো-ভাকিয়াকে শৈল্পিক পন্থায় ও ইতালিকে দেখা গেল দুর্ধর্ষ ভঙ্গিতে খেলতে। ছলাকলাবিদ চেকোশ্লোভাকিয়া প্রথমার্ধে এগিয়ে যায়। ইতালি গোল শোধ দেয় খেলা ভাঙার ৬ মিনিট আগে। একটি উঁচু সোয়ার্ভ করা শট্ প্ল্যানিকাকে প্রলুব্ধ করে এড়িয়ে টপকে তার পিছনে জালে গিয়ে পড়ে। চিলিতে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ১৯৬২-র ফাইনালে ওই ধরনের একটি শট্ চেকোশ্লোভাকিয়ার গোলকীপার স্রইফকে তাজ্জব বানায়। চেকোশ্লোভাকিয়া ১৯৬২'তেও হেরেছে। ইতালি অতিরিক্ত সময়ে গোল করায় ওরা হেরেছিল ১৯৩৪ সালেও।

আবার আয়োজনকারী দেশই জিতল। আরও আশ্চর্য ব্যাপার যে সারা প্রতিযোগিতায় গোল হয়েছিল সত্তরটি। যাহোক এবারে ১৯৩০'এর আঠারটি খেলার পাল্টা জবাবে গেম হয়েছিল মাত্র সতেরটি।

যদিও অ্যামেচার ফুটবল এখনো চালু রয়েছে তবু ১৯৩৪'এর অনুষ্ঠান শেষে শোনা গেছে চেক ফুটবলাররা ফাইনালে হেরে গেলেও পরে মোটা বোনাস পেয়েছিল। সেদিকে ইতালির ফুট-বলাররাও পাঁচ হাজার লিরা পেয়েছিল সেমিফাইনালে অষ্ট্রিয়াকে হারানোর পরে। ফাইনাল খেলার পরেও প্রত্যেকটি প্লেয়ার বড় সোনার মেডেল ছাড়াও ১০ হাজার লিরা পেয়েছিল। এটাই কানাঘুষায় শুনতে পাওয়া যায়।

চেকের জয়লাভকে সংবর্ধিত করার জন্যে প্রাগ রেলষ্টেশনে জমায়েত হয়েছিল প্রায় কুড়ি হাজারের ওপব ফুটবল উৎসাহী জনতা। এই সম্মান জার্মান টিমও পেয়েছে, তবে অষ্ট্রিয়া কেন চতুর্থ স্থানে নামল সে নিয়ে তাদের দেশে খুবই হৈ চৈ হয়েছে।

মোট ফলাফল হিসেবে বলা যেতে পারে ফুটবলে সফল হওয়াটা জাতীয় সম্পত্তির মত ইউরোপের দেশগুলো মেনে নিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের থমথমানি ওয়ার্ল্ড কাপের তৃতীয় অনুষ্ঠান

ফ্রান্সে ১৯৩৮'এর বিশ্ব কাপের খেলা শুরু হওয়ার আগেই ইউরোপের আকাশ ছেয়ে ফেলল যুদ্ধের মেঘে। স্পেন গৃহযুদ্ধে নেম পড়েছিল তার আগেই। হিটলারের আগ্রাসী নীতি ইতিপূর্বেই গিলে ফেলেছিল অষ্ট্রিয়াকে। আসলে জার্মানি অধিকৃত অষ্ট্রিয়া নিজেদের গুটিয়ে নেওয়ায় পনেরটি দেশ খেলা আরম্ভ করলে সুইডেনকে দ্বিতীয় রাউণ্ডে 'বাই' দেওয়া হয়।

প্রতিযোগিতার তীব্রতা এত বেশি ছিল যে প্রথম রাউণ্ডেব সাতটি খেলার মধ্যে দুটি অমীমাংসিত থাকে ও তিনটি ম্যাচ গড়িয়েছে বাড়তি সময় পর্যন্ত, সবচেয়ে সাড়াজাগানো ম্যাচ হয়েছিল সুইজারল্যাণ্ড ও জার্মানির মধ্যে।

জার্মানি-সুইজারল্যাণ্ডেব মধ্যে প্রথম খেলায় দুর্দান্ত লড়াই শেষে ম্যাচটি ড্র থেকে যায় ১—১ গোলে। এই ম্যাচটিতে চারজন অষ্ট্রিয়ানকে জার্মান দলে দেখা যায়। এদের পরে জার্মান বলে মেনে নেওয়া হয়। মাত্র তিনজন অষ্ট্রিয়ান ফিবতি খেলায় যোগ দেয়, হাফ টাইমে জার্মানি ২-০ গোলে এগিয়ে থাকায় মনে হয়েছিল জার্মানি জিতবেই। কিন্তু ট্রেলো অ্যাবেগলেনের দক্ষতায় উদ্বুদ্ধ সুইজারল্যাণ্ড পরাজয় থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়লাভ কবে ৪-২ গোলে।

জনপ্রিয় টিমের অন্যতম চেকোশ্লোভাকিয়া শেষমেষ দশজনের টিম

হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে গোল করতে না পারায় প্রথম ঠোক্কর খায়। নব্বুই মিনিট পরেও খেলা গোলশূন্য থাকায় অতিরিক্ত সময় খেলানো হল। তখন দশটি দুঃসাহী ওলান্দাজ ক্লান্ত হয়ে যাওয়ায় চেকো-শ্লোভাকিয়া টপাটপ তিনটি গোল করে জেতে। ইতালিকেও নরওয়েকে হারাতে প্রয়োজন হয়েছে বাড়তি সময় খেলানোর।

এদিকে লিওণিডাস ওদিকে উইলিময়েস্কি

রাউণ্ডের ম্যাচগুলোয় ব্রাজিল ও পোল্যাণ্ডের ম্যাচটিই ছিল খেলার মত খেলা, যাকে রীতিমত সংঘর্ষ বলা যেতে পারে। ব্রাজিলের নামকরা সেণ্টার ফরোয়ার্ড লিওনিডাস হাফ টাইমের আগে উপর্য্যুপরি তিনবার গোল করায় ব্রাজিল ৩-১ গোলে এগিয়ে থাকে। ধরে নেওয়া হয় খেলা একরকম তাদের অনুকুলে শেষ হবে। এই ভুল ধারণার সময় পোল্যাণ্ডের কুশলী ফরোয়ার্ড উইলিময়েস্কির কথা ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে তিনি তাঁর হ্যাটট্রিক পুরো করলে অতিরিক্ত সময়ে ফলাফল দাঁড়ায় ৪-৪। শেষে ব্রাজিল জেতে ৬-৫ গোলে। এতে লিওনিডাস ও উইলিময়েস্কি দুজনেই চারটি করে গোল করেন।

ইতালি আবার বিজয় মঞ্চে

কোয়ার্টার ফাইনালে আমন্ত্রণকারী দেশের পক্ষে পুনর্বার বিজয়ী হওয়ার আশা চুরমার হয়ে যায়। এই রাউণ্ডের অপর খেলায় ব্রাজিল ও চেকোশ্লোভাকিয়ার খেলাগুলি হয় নিচু মানের। মাঠ থেকে দুজন খেলোয়াড়কে বের করে দেওয়া হয়, দুজনের হাড় ভাঙে এবং একটি মাত্র পেনাল্টিতে গোল করে চেকোশ্লোভাকিয়া খেলাটি অমীমাংসিত রাখে। পুনরুষ্ঠিত ম্যাচে চেকোশ্লোভাকিয়ার দলে

ছটি ও ব্রাজিল টিমে দেখা যায় তিনটি নতুন মুখ। খেলাটি উঁচু দরের হওয়ায় সকলেই আশ্চর্য হয়। ব্রাজিল হাফ্ টাইমে এক গোলে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয়ার্ধে ভাল খেলে জিতে যায় ২-১ গোলে। যদিও এটা জয়লাভ তবু এই খেলায় তাদের এত শক্তি ক্ষয় হয় যে সেমিফাইনালে ব্যর্থ হয় ইতালির বিরুদ্ধে।

অতএব দ্বিতীয়বার ফাইনালে গেছে। এবং সেমিফাইনালে হাঙ্গেরি সুইডেনকে পর্যুদস্ত করায় ১৯ জুন প্যারিসের কলম্বাস ষ্টেডিয়ামে ইটালি ও হাঙ্গেরি মুখোমুখি হয় ফুটবলে বিশ্ব খেতাব পাওয়ার প্রয়োজনে। এই ম্যাচটিতে দ্রুত ও খাটিয়ে ইটালিয়ানরা অধিকতর পরিপাটি ও কুশলী হাঙ্গেরিয়ানদের উপর টেক্কা দিয়ে যেতে থাকে। সূচনার পাঁচ মিনিট পরেই ইটালি গোল করে। এর পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাঙ্গেরি গোল শুধে দিলেও খেলাটি মাত্র সিকি ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই ইতালি দ্বিতীয় গোলটি দেয়। তারা বিরতির সময় ৩-১ গোলে এগিয়ে থেকে শেষে ৪-২ গোলের পার্থক্যে জয়লাভ করে, এবং উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার ওয়ার্ল্ড কাপ পায়। বস্তুত এই সৌভাগ্য তার আগে ও সেই থেকে আজ পর্যন্ত কারো অর্জন করা সম্ভব হয়নি। অতঃপর সেই থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ওয়ার্ল্ড কাপ আর ১৯৫০'এর আগে চালু করা যায়নি।

খেলার ফলাফল

১৯৩০

উরুগুয়ে

পুল ১

ফ্রান্স—৪ = ম্যাজিনো (২) লবে ল্যাঞ্জিলাব
মেক্সিকো—১ = ক্যাবেনো

আর্জেন্টিনা—১ = মন্তি
ফ্রান্স—০

চিলি—৩ = সুবিয়াব্রে (২) ভিদাল্
মেক্সিকো—০

চিলি—১ = সুবিয়াব্রে
ফ্রান্স—০

আর্জেন্টিনা—৬ = স্ত্যাবিল (৩) ভ্যারাল্লো (২) জুমেল্জু
মেক্সিকো—৩ = লোপেজ, রোসাস (এফ) রোসাস (এম)

আর্জেন্টিনা—৩ = স্ত্যাবিল (২) এভারিষ্টো (এম)
চিলি—১ সুবিয়াব্রে

কে ? কোথায় ?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
আর্জেন্টিনা	৩	৩	০	০	১০	৪	৬
চিলি	৩	২	০	১	৫	৩	৪
ফ্রান্স	৩	১	০	২	৪	৩	২
মেক্সিকো	৩	০	০	৩	৪	১৩	০

পুল ২

যুগোশ্লোভিয়া—২ = টিরনানিক, বেক
ব্রাজিল—১ = নেটো

যুগোশ্লোভিয়া—৪—বেক (২) ম্যারিয়ানোভিক, উজাদি-নোভিক
বলিভিয়া—০

ব্রাজিল—৪ = নেটো, ভিসিনতেনার (২)
বলিভিয়া—০

কে ? কোথায় ?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
যুগোশ্লাভিয়া	২	২	০	০	৬	১	৪
ব্রাজিল	২	১	০	১	৫	২	২
বলিভিয়া	২	০	০	২	০	৮	০

পুল ৩

রুমানিয়া—৩ – স্থসিন (২) বাব
পেরু—১ = সুজা

উরুগুয়ে—১ = ক্যাস্ত্রো
পেরু—০

উরুগুয়ে—৪ = স্ক্যাবোন, দোরাদো, অ্যানসেলমো, সিয়া
রুমানিয়া—০

কে ? কোথায় ?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
উরুগুয়ে	২	২	০	০	৫	০	৪
রুমানিয়া	২	১	০	১	৩	৫	২
পেরু	২	০	০	২	১	৪	০

পুল ৪

যুক্তরাষ্ট্র—৩ = ম্যাকঘি (২) পেটেনদ
বেলজিয়াম—০

যুক্তরাষ্ট্র—৩ = পেটেনদ (১) ফ্লো'ব
প্যারাগুয়ে—০

প্যারাগুয়ে—১ = পেনা
বেলজিয়াম—০

কে ? কোথায় ?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
যুক্তরাষ্ট্র	২	২	০	০	৬	০	৪
প্যারাগুয়ে	২	১	০	১	১	৩	২
বেলজিয়াম	২	০	০	২	০	৪	০

সেমিফাইনাল

আর্জেণ্টিনা—৬ = পিউসেলে (২) স্তবিল (২) মস্তি, স্কোপেলি।
যুক্তরাষ্ট্র—১ = ব্রাউন

উরুগুয়ে—৬ = সিয়া (৩) অ্যানসেলমো (২) ইরিআর্তে
যুগোশ্লাভিয়া—১ = সেকুলিক

ফাইনাল

উরুগুয়ে—৪ = ক্যাস্ত্রো, সিয়া, দোরাদো, ইরিআর্তে
আর্জেণ্টিনা—২ = পিউসেলে, স্তবিল

সবশেষে

কে ? কোথায় ?

প্রথম—উরুগুয়ে, দ্বিতীয়—আর্জেণ্টিনা, তৃতীয়—যুক্তরাষ্ট্র ও যুগোশ্লাভিয়া।

১৯৩৪

ইতালি

প্রথম রাউণ্ড

ইতালি—৭ = শিয়াভিয়ো (৩) ওরসি (২) ফেবারি, মিয়াজ্জা
যুক্তরাষ্ট্র—১ = ডোনেলি

জার্মানি—৫ = কোনেন (৩) কোবিয়াস্কি (২)
বেলজিয়াম—২ = ভুবহুফ (২)

চেকোশ্লোভাকিয়া—২ = পুক, নেজেদলি
রুমানিয়া—১ = দোবাই

হাঙ্গেরি—৪ = টোলদি (২) ভিঙ্কৎসে, টেলেকি
মিশর—২ = ফউজি (২)

স্পেন—৩ = ল্যাঙ্গারা (২), ইবারোগোবি
ব্রাজিল—১ = সিলভা

সুইডেন—৩ = জোনাজ্জোন (২) ক্রুন
আর্জেন্টিনা—২ = গ্যালেসিও, বেলিস

সুইজারল্যাণ্ড—৩ = কিলহোলৎস (১) অ্যাবেগ্লেন
হল্যাণ্ড—২ = স্মিট, ভেণ্টে

অষ্ট্রিয়া—৩ = শাল, সিণ্ডেলার, বিকান।
ফ্রান্স—২ = নিকোলাস, ভেরিয়েস্ট

কোয়ার্টার ফাইনাল

অস্ট্রিয়া—২ = হরওয়ার্থ, জিসছেক
হাঙ্গেরি—১ = সারোসি

চেকোশ্লোভাকিয়া—৩ = স্বোবোদা, সোবোটকা, নেজদলি
সুইজারল্যাণ্ড—২ = কিলহোলৎস, অ্যাবেগ্লেন

জার্মানি—২ = হোম্যান (২)
সুইডেন—১ = ডাঙ্কার

ইতালি—১ = ফেরারি
স্পেন—১ = রেগুইরো

রি-প্লে

ইতালি—১ = মিয়াজ্জা
স্পেন—০

সেমিফাইনাল

চেকোশ্লোভাকিয়া—৩ = নেজেদলি (২) ক্রিল
জার্মানি—১ = নোয়াক

ইতালি—১ = গুয়াইটা
অস্ট্রিয়া—০

তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণায়ক খেলা

জার্মানি—৩ = লেনার (২) কোনেন
অষ্ট্রিয়া—২ = হরওয়ার্থ, শেস্তা

ফাইনাল

ইতালি—২ = ওরসি, শিয়াভিও
চেকোশ্লোভাকিয়া—১ = পুক (অতিরিক্ত সময়ে)

কে? কোথায়?

প্রথম—ইতালি ; দ্বিতীয়—চেকোশ্লোভাকিয়া ; তৃতীয়—জার্মানি ; চতুর্থ—অষ্ট্রিয়া।

১৯৩৮

ফ্রান্স

প্রথম রাউণ্ড

ব্রাজিল—৬ = লিওনিডাস (৪) রোমিও, পেরাসিও
পোল্যাণ্ড—৫ = উইলিমওস্কি (৪) পিওনটেক (অতিরিক্ত সময়ে)

কিউবা—৩ = টিউনাস, ম্যাকুইনা, সোসা
রুমানিয়া—৩ = কোভাচি, বারাতকি, দোবাই

চেকোশ্লোভাকিয়া—৩ = কোষ্টালেক, বউচেক, নেজেদলি
হল্যাণ্ড—০ (অতিরিক্ত সময়ে)

ফ্রান্স—৩ = নিকোলাস (২) ভিনান্তে
বেলজিয়াম—১ = আইসেমবর্গস

হাঙ্গেরি—৬ = সারোসি (২) সেঙ্গেলাব (২) টোলদি, কোহাট
ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ—০

ইতালি—২ = ফেরারি, পিওলা
নরওয়ে—১ = ব্রাষ্টাদ্ (অতিরিক্ত সময়ে)

সুইজারল্যাণ্ড—১ = অ্যাবেগগ্লেন
জার্মানি—১ = গশেল

রি-প্লে

কিউবা—২ = সোকোরো, ম্যাকুইনা
রুমানিয়া—১ = দোবাই

সুইজারল্যাণ্ড—৪ = অ্যাবেগগ্লেন (২) ওয়ালাশশেক, বিকেল
জার্মানি—২ = হ্যানিম্যান, লোয়ার্টশার (নিজ গোল)

কোয়ার্টার ফাইনাল

ব্রাজিল—১ = লিওনিডাস
চেকোশ্লোভাকিয়া—১ = নেজেদলি (পেনাল্টি)

হাঙ্গেরি—২ = সেঞ্জেলার (২)
সুইজারল্যাণ্ড—০

ইতালি—৩ = পিওলা (২) কোলাওজি
ফ্রান্স—১ = হিসেববার

সুইডেন—৮ = ওয়েটারস্ট্রোম (৪), এইচ, অ্যাণ্ড্রাবসন,
জোনাজ্জোন, কেলার, নি
কিউবা—০

রি-প্লে

ব্রাজিল—২ = লিওনিডাস, রবার্টো
চেকোশ্লোভাকিয়া—১ = কোপেকি

সেমিফাইনাল

হাঙ্গেরি—৫ = সেঞ্জেলার (৩), টিটকোস, সারোসি
সুইডেন—১ = নিবার্গ

ইতালি—২ = মিয়াজ্জা (পেনাল্টি), কোলাওজি
ব্রাজিল—১ = রোমিও

তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণায়ক খেলা

ব্রাজিল—৪ = লিওনিডার্স (২), রোমিও, পেরাসিও
সুইডেন—২ = জোনাজ্জোন, নিবার্গ

ফাইনাল

ইতালি—৪ = কোলাওজি (২) পিওলা (২)
হাঙ্গেরি—২ = টিটকস, সারোসি

প্রথম —ইতালি , দ্বিতীয় —হাঙ্গেরি , তৃতীয়—ব্রাজিল ,
চতুর্থ - সুইডেন ।

১৯৫০

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ, আবার ওয়ার্ল্ড কাপ সুরু

ইতিমধ্যে পৃথিবী ধ্বংসের সম্ভাবনা কমে এসেছে। অন্যান্য দেশের অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে একতালে ইংল্যাণ্ডও আবার ফিফা'র সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়নশিপের কদর বাড়ল আরও। ১৯৫০'এর ওয়ার্ল্ড কাপে শেষ পর্যায়ে খেলার জন্যে কোয়ালিফাইং পর্যায়ের রেওয়াজ চালু হতেই প্রথম থেকে আশা করা হল, স্কটল্যাণ্ড হয়তো ব্রিটিশ চ্যামপিয়ন হয়ে ব্রাজিলে খেলতে যাবে। তারা ব্রিটিশ চ্যামপিয়ন না হওয়ায় অগত্যা ঘরেই পড়ে রইল, শুধু খেলতে গেল ইংল্যাণ্ড।

কেউ ভেবে বসল যে প্রতিযোগিতা আবার শুরু করার জন্য ১৯৫০ সাল যেন সাততাড়াতাড়ি জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থা। কতকগুলি দেশ তখনও যুদ্ধের বিধ্বস্ততা থেকে সেরে ওঠেনি, এবং অন্যান্যরা ১৯৩৯-৪৫এর রাজনৈতিক ডামাডোল থেকে ধীরেসুস্থে আরোগ্য লাভের মাঝপথে। ১৯৪৫এ মস্কো সফরে রাশিয়ান ফুটবলেরমিটমিটে অস্তিত্ব দেখা গেলেও পরে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি, হাঙ্গেরিও ইউরোপের ফুটবলে বড় আঘাত হানার জন্যে তাক লাগানো টিম তৈরী করার চুপিচুপি চেষ্টা চালায়। সক্রিয় হয়ে ওঠে চেকোশ্লোভাকিয়া। অষ্ট্রিয়াও তার টিমের উপর তেমন আস্থাবান ছিল না। আর্জেন্টিনা বহুদিন ধরে যেভাবে ব্রাজিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উঠেপড়ে লেগেছিল তাতে কেউ ভাবেনি যে তাদের পক্ষে বিশ্ব কাপ আয়োজনের সমর্থন করা সম্ভব হবে।

ভারত প্রথম নাম দিয়েও ভরসা পায়নি

বিশ্ব কাপ খেলার জন্যে যে চারটি গ্রুপ তৈরী হয়েছিল তাতে তৃতীয় গ্রুপে ভারতেরও নাম ছিল। প্রথমে ঠিক হয়েছিল ষোলটি দেশ খেলবে। কিন্তু স্কটল্যাণ্ড, তুরস্ক ও পরে ভারত তাদের নাম প্রত্যাহার ক'রে নেয়, একেবারে শেষের দিকে ফ্রান্স যোগ দেওয়ায় মোট টিম সংখ্যা দাঁড়ায়—চৌদ্দ।

ওয়াল্টাতে উইণ্টারবটমের পরিচালনায় যে ইংল্যাণ্ডের টিম ব্রাজিলে গিয়েছিল তাতে ছিল কয়েকজন ভালো খেলোয়াড়। অ্যালফ র‍্যামজি ছিল ফুলব্যাক, আর ছিল টম ফিনি। স্ট্যান মর্টেনসেন, উইলফ ম্যানিয়ন, জিমি মুলেন এবং স্ট্যানলি ম্যাথুজ, উইং ফরোয়ার্ড। ম্যাথুজ তখন খ্যাতির মাঝ গগনে।

ব্রাজিলিয়ান বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেছিলেন এবার ওয়ার্ল্ড কাপের দাবিদার বল'তে ইংল্যাণ্ড টিমকে ধরা যেতে পারে। ব্রাজিলের ফুটবল ম্যানেজার, সাংবাদিক ও বেতার ভাষ্যকারের একটি দল রায়ো-ডি-জেনেরো থেকে লণ্ডনে ছুটেছিল ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের খেলা দেখতে। সেই খেলার বিবরণ তারা দেশবাসিকে জানিয়েওছিল।

ইংরেজদের ছিল প্রকাণ্ড প্রত্যাশা। তারা ভাবত, ফুটবল তাদেরই খেলা এবং বিদেশে যারা খেলে তারা হাস্যকর অবস্থা থেকে সামান্য মাত্র উন্নত। তাদের কয়েকটি খেলোয়াড় ছিল যারা ওরই মধ্যে একটু বেশি রকম নড়তে চড়তে পারত। ওদের কেউই স্যুট করা ও হেড দেওয়ায় অভ্যস্ত ছিল না। ইংল্যাণ্ডকে চিলি, স্পেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মত কাঁচা টিমের গ্রুপে রাখা হয়েছে জেনে বহু কর্মকর্তা সমর্থকদের মুখে দেখা গেল তৃপ্তির হাসি, কিন্তু তাদের ওই খোশমেজাজও দ্রুত পাল্টাতে হয়েছে।

ইংল্যাণ্ডের প্রথম প্রত্যাশার সমাধি

ফলাফল যে কি হতে পারে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল ইংল্যাণ্ডের প্রথম খেলাতেই। চিলির বিরুদ্ধে এই খেলার জন্যে বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়েছিল দুই লক্ষ দর্শকের আসন সম্বলিত রায়ো-ডি-জেনিরোর মারকানা স্টেডিয়াম। ফাইনালের আগের দিন পর্যন্ত স্টেডিয়াম সম্পূর্ণ শেষ করা সম্ভব হয়নি। পরে অনেকদিন যাবৎ পড়েছিল অসংস্কৃত অবস্থাতেই। এখন স্টেডিয়ামটি নতুন ভাবে তৈরি করে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে ম্যারিও ফিলহো স্টেডিয়াম। এদিকে বৃষ্টি-ভেজা নরম মাঠ ছিল ইংল্যাণ্ডের পক্ষে অনুকূল। ফলে সেদিন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ২-০ গোলে চিলিকে হারাতে কোন কষ্টই হয়নি।

পৃথিবীতে ইংল্যাণ্ডই একমাত্র ফুটবল যোদ্ধার জাত। কথাটা ইংরেজরা যে বিশ্বাস করে তা প্রমাণ করার জন্যে অনেক চেষ্টাও করেছে। এর পরের ধাপে হাস্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বেলোহরাইজেণ্টোতে। এখন এটি আড়ম্বরহীন একটি শহর। সেখানে গর্ব করার মত সুন্দর বিরাট স্টেডিয়াম রয়েছে কিন্তু তখন ওই শহরটিতে একটি ছোট্ট মাঠ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমেরিকান দলটি গড়া হয়েছিল পাঁচমিশেলী খেলোয়াড় নিয়ে। এই দলে এডি ম্যাকিলভেলি নামে একজন স্কচকেও নেওয়া হয়। এডি ইংল্যাণ্ডের ফুটবল লীগে রেক্সহ্যামের হয়ে খেলত। পরে ওকে নিখরচায় দল বদলের অনুমতি দিলে ও চলে যায় ইংল্যাণ্ড ছেড়ে। এদিকে বেলজিয়াম, হাইতি, স্পেন এবং উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সব জায়গার অধিবাসীরাই আমেরিকার ওই দলে জায়গা পায়।

আগের খেলায় স্পেনের কাছে আমেরিকা ৩-১ গোলে হেরে যাওয়ায় আমেরিকান সমর্থকেরা পরবর্তী খেলাতেও শোচনীয় হার ছাড়া আর কিছু নতুন খেলোয়াড়েরা আশা করতে পারেনি।

প্রথমেই ইংল্যাণ্ডকে বারবার আক্রমণ করতে দেখে সকলেই ধরে নিল শেষ পর্যন্ত ফলাফল আমেরিকার রাগবি ম্যাচের মতই দাঁড়াবে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের প্লেয়াররা গোলের জালে বল ঢোকানো বাদ দিয়ে বার, পোস্ট ও প্রতিপক্ষের গোলকীপারের গায়েই অনবরত বল মেরেছে।

ইংল্যাণ্ডের প্লেয়ার নিছক শুট করতে করতে ভাবল যে এইসব শুটিং থেকেই গোল হওয়া উচিত। কিন্তু তা সম্ভব হল না। শেষে টিমটা হয়ে উঠল বিশেষ উদ্বিগ্ন। এই ফাঁকে আমেরিকানরা ওদের প্রতিরোধ ভেদ করে, ইংল্যাণ্ড যা ভাবতে পারেনি, সেই গোল করে বসল, বিরতির আগেই। এখন হতাশা সংক্রামিত হল ইংল্যাণ্ড টিমে। প্রতি মিনিটেই নিরাশ হতে হতে ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করতে লাগল। হঠাৎ হুইস্‌ল বাজল, সবশেষে অবিশ্বাস্য ঘটনা—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ফুটবল খেলায় ইংল্যাণ্ডকে হারাল ২-০ গোলে।

স্তম্ভিত নিউ ইয়র্ক টাইমসের ক্রীড়া দফতর

ফুটবল জগত হল অবাক। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নিজেরাও, তারা অবাক বিস্ময়ে ভ্রু কোঁচকাল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে এই খেলার ফলাফলকে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' 'অদ্ভুত' আখ্যা দিয়ে হয়তো ছাপত। কিন্তু তারবার্তায় "ইউনাইটেড স্টেটস—১ ঃ ইংল্যাণ্ড—০" এইভাবে পড়ে বিশ্বাস করতে পারল না। তারা স্কোরটিকে ভাবল "ইউনাইটেড ষ্টেটস—১ ঃ ইংল্যাণ্ড—১০"।

আমেরিকার কর্মকর্তারাও হয়ে উঠলো আনন্দে ডগমগ। তাঁরা অনুভব করলেন যে আমেরিকানদের মধ্যে ফুটবলের প্রসারের জন্য এই রকমের সাড়া জাগানো ফলাফলের প্রয়োজন আছে। হাল আমলে টাকাই ফুটবলে সফলতার একমাত্র উপাদান। এই কথায় বিশ্বাসী হয়ে আমেরিকানরা হাজার হাজার ডলার ছড়ান সত্ত্বেও তাদের ফুটবল খেয়ালী খেলা হিসাবে দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হল।

স্বভাবতই ফলাফল অবিশ্বাস্য হলেও এতেই ইংল্যাণ্ডের ফুটবল খেলার ভিতে কাঁপন ধরাল। ইংল্যাণ্ড খুবই সামান্য আঁচ করতে পেরেছিল যে ফুটবলে গুরুমশায়ের পরিবর্তে জ্ঞান গরিমায় ইংল্যাণ্ড কয়েক দশক পিছনে।

১৯৫০ এর বিশ্বকাপ সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের আকর্ষণ শেষ হয়ে গেল। স্পেনের সঙ্গে তখনো একটি খেলা বাকি ছিল। স্ট্যানলি ম্যাথুজের দলে ঢোকার সঙ্গে টিমে মোট পাঁচজন খেলোয়াড় বদলান হল। তবুও এতে তেমন সুবিধা হলনা। স্পেন জয়লাভ করল ১-০ গোলে এবং ইংল্যাণ্ডের হল প্রস্থান। ইংল্যাণ্ডের সব খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, সাংবাদিক সকলেই দেশে ফিরলো কারণ ইংল্যাণ্ড হেরে যাওয়ায় প্রতিযোগিতায় আর কোন বাড়তি টান ছিল না ইংল্যাণ্ডের, অন্য খেলাগুলি দেখে শেখারও আগ্রহও ছিল না।

দুই অসাধারণ সহোদর ফুটবলার জর্জ ও টেড

প্রতিযোগিতায় তখনো কিছু আকর্ষণ বাকি ছিল। উদাহরণস্বরূপ চিলির আক্রমণভাগের নায়ক ইংলিশ ফুটবল লীগের বার্নসলে ইউনাইটেডের দুই খেলোয়াড় জর্জ রোবলডো ও তার ভাই টেড। কিন্তু পরে টেড নিউজিল্যাণ্ডের হয়েও খেলেছিলেন। ভাইয়ের জন্ম চিলিতে কিন্তু দুজনেই ইংল্যাণ্ড ছেড়ে দিয়েছিলেন চিলির হয়ে খেলার জন্যে। চিলিতে ১৯৬২'তে যখন ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা হয়েছিল সেসময় জর্জ ইংল্যাণ্ডের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠেন।

যে সুইডিশ টিম ইতালিকে ৩-২ গোলে হারিয়ে উল্টো ফলাফলের সৃষ্টি করে সেই সুইডিশ দলের উপর ইংল্যাণ্ডের দরদ ছিল, কেননা ওই টিমের ম্যানেজার জর্জ রেনর ছিল ইয়র্কশায়ারের লোক।

রেনর ছিল এক আজব মানুষ, কয়েকটি সাধারণ টিমের মধ্যে সেও ছিল এক নগণ্য খেলোয়াড়। তবুও ম্যানেজার হিসেবে

খুব নাম করেছিল। ওদিকে ফিফা-এর সভাপতি স্ট্যানলি রাউস জর্জ আর.টেডের জন্য প্রস্তাব রাখেন রেনরের কাছে খেলোয়াড় খোঁজায় ও কোচ করার জন্যে সে যেন সারা দেশ চষে ফেলে।

১৯৪৮'এ লণ্ডন অলিম্পিকে রেনর তাঁর সুইডিশ টিম এনেছিলেন। ফাইনাল জিতে স্বর্ণপদক পেতেই ইতালির ক্লাবের সমর্থকরা তাকে ছেঁকে ধরে। টাকার লোভে সুইডেনের বাকি অ্যামেচার প্লেয়াররা ইতালিতে খেলতে রাজি হওয়ায় অলিম্পিক বিজয়ী সুইডিশ দল ভেঙে যায়।

আদর্শ কোচ জর্জ রেনর

ত্তালিয়ানরা এবপরে রেনরকেও চেয়ে বসল। এবং প্রথমেই প্রস্তাব দিল খেলোয়াড় জো াড় করার। রেনর কিন্তু মোটা টাকার প্রস্তাব পেয়েও রাজি হলেন না। এক সময় ওঁকে তুটি উঁচু জাতের ইনসাইড ফরোয়ার্ডের নাম করতে অনুরোধ করা হলে রেনর জবাব দেন—"ওরকম কোন পন্থা বাতলালে অ্যালেক্স জেমস ও ডেভিড জ্যাক আমাকে মানবে না।"

জর্জ রেনর কিন্তু খেলোয়াড়দের দলবেঁধে দেশ পাল্টানোর হুজুগে বাধা দিতে পারলেন না। ১৯৪৮'এর অলিম্পিক এবং ১৯৫০'এর ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার মধ্যে সুইডেন হারাল গানার নর্ডাল তখনকার বিশ্ব ফুটবলে সর্বোৎকৃষ্ট সেণ্টার ফরোয়ার্ড এবং বার্টিল নর্ডাল, গানার গ্রেন, নিলস লিডহোম ও হেনরি কার্লসন প্রমুখকে। কোন দেশই এমন আঘাত কাটিয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু রেনরের কৃতিত্বে সুইডেন তা পেরেছিল।

রেনর অতি দ্রুত আবার দল গড়ে তুললেন, হ্যানস জেপসনের মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন নতুন গানডারকে। এমনকি কিছুদিনের জন্যে জেপসন চার্লটন অ্যাথলেটিক ক্লাবেও খেলেছিলেন অ্যামেচার হয়ে। সেখানে সাধারণের চেয়ে উঁচু মানের খেলা দেখালেন রেনর,

তৈবি কবলেন কালো পামাব ও অবিস্মবণীয ন্যাক্কা স্কোগ্লাণ্ডকে। এজন্যই ব্রাজিলে ইতালিব বিরুদ্ধে খেলাব সময বেনব ছিলেন নিশ্চিন্ত। ইতালি ঝটিতি একটি গোল কবে ফেললেও তিনি বিচলিত হননি। হাফটাইমেব সামান্য পবেই সুইডেন বইল ৩-১ গোলে এগিযে। ইতালি এব পবে আব একটি গোল কবতেই বেনবেব জাদু আবাব কার্যকব হতে থেকেছে কিন্তু তাব পুবস্কাব? পবে পেশাদাব হযে খেলাব জন্যে তাব দলেব আটজন খেলোযাড ইতালিতে চলে যায।

পববর্তী ম্যাচেই সুইডেনেব ফাইনাল পুলে খেলাব যোগ্যতা অর্জনেব জন্যে পেযে গেল দবকাবি পযেন্টটি। এতে স্পেন ও উরুগুযেব সঙ্গে একই গ্রুপে ব্রাজিল গেল।

উরুগুয়ে আবার জয়ের পথে

বলিভিযাব বিরুদ্ধে গোলে জিতে উরুগুযে একলাফে পৌঁছল প্রথম বাউণ্ড থেকে ফাইনালে। ওই গ্রুপে ফ্রান্স থাকলেও শেষ মুহূর্তে তাবা নাম প্রত্যাহাব কবলে উরুগুযেব পথ সহজ হযে যায।

সেই প্রথম এব একমাত্র বাব চূড়ান্ত বিজযী নির্ণয কবতে চাবটি গ্রুপ বিজযীকে খেলান হয লীগ প্রথায। শেষ বিশ্বযুদ্ধেব পবে অন্যান্য প্রতিযোগিতায গ্রুপেব বিজযী এবং বিজিত দল খেলেছে কোযার্টাব ফাইন্যাল। এই ধাপ থেকে প্রতিযোগিতা রূপ নিয়েছে নক-আউটে।

আবাব ফিবছি ডক্টর বেনবেব কথায। বাযো-ডি-জেনিবোতে যখন সুইডেন ব্রাজিলেব কাছে ৭-১ গোলে হাবল, ওযাল্ড কাপেব দীর্ঘ সাফল্যেব ফর্দে সুইডেনেব নাম যোগ কবাব আশা উবে গেল। পবেব ম্যাচে স্পেনও ৬-১ গোলেব তফাতে হাবলে প্রায নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ব্রাজিল ট্রফি পেতে চলেছে।

স্পেনের কাছে উরুগুয়ে একটি পয়েন্ট নষ্ট করার পরেও সুইডেনের কাছেও হারাতে বসেছিল দুটি পয়েন্ট। দুবার সুইডিশরা এগিয়ে থেকেছে। শেষে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ায় ৩-২ গোলে হেরে যায়। তাহলেও স্পেনকে হারিয়ে পেয়েছে তৃতীয় স্থান। এটাও ভালভাবে মনে রাখা উচিত যে জর্জ রেনরের সুইডেন শুধু ইতালিকে এক ঝাঁক প্লেয়ার দিয়েই দরিদ্র হয়ে পড়েছিল। এবং তার ফলে ইতালি ১৯৫৮তে অলিম্পিক গেমসে জিতেছে। ১৯৫০'এর বিশ্বকাপে তারা পেয়েছে তৃতীয় স্থান। ১৯৫২'এর ওলিম্পিক গেমসে জিতেছে ব্রঞ্জ এবং ১৯৫৮তে বিশ্বকাপে পেয়েছে দ্বিতীয় স্থান। সত্যিই এক অদ্ভুত নজির।

একবার ইংল্যাণ্ডের ফুটবলাররা পিছিয়ে পড়ে শুধু জর্জ রেনরকেই একমাত্র বিষয়বস্তু বলে গণ্য করেনি। আর একজন জর্জও ছিল তিনি হলে—জর্জ রিডার। তখনকার দিনে তিনি ছিলেন বিশ্বের অন্যতম আন্তর্জাতিক রেফারি। পরে তিনি সাউদামটন ফুটবল ক্লাবের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন।

ফার্স্ট রাউণ্ডে গ্রুপের উদ্বোধনী ম্যাচে যে খেলায় ব্রাজিল মেক্সিকোকে ৪-০ গোলে হারায় ও উরুগুয়ে যে খেলাতে বলিভিয়াকে ৮-০ গোলের প্রচণ্ড মার দেয় সে খেলাতেও রেফারিং শেষে উনি ফাইনাল গ্রুপে ওয়েলসের মার্ভিন গ্রিফিত, ইংল্যাণ্ডের আর্থার এলিস ও বেগ লিফের সঙ্গে যোগ দিলেন।

মহা জিজ্ঞাসা : উরুগুয়ে না ব্রাজিল ?

১৯৫০'এর ওয়ার্ল্ড কাপে জর্জ রিডার যেমন প্রথম খেলাটি পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন তেমনি মারাকানাতে জনপ্রিয় ব্রাজিল ও উরুগুয়ের শেষ খেলার দায়িত্বও উনি নিয়েছেন। ওই খেলার দিন পর্যন্ত দুটি ম্যাচে ব্রাজিল পেয়েছিল চার পয়েন্ট, উরুগুয়ে তিন। তখন এটা পরিষ্কার ধারণা হয়ে যায় যে ব্রাজিল খেলাটি ড্র করতে

পারলেই চারবার বিশ্বকাপ খেলার মধ্যে আমন্ত্রণকারী দেশ হিসাবে জয়ী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে তিনবার।

অসমাপ্ত স্টেডিয়ামে যাওয়ার পথ বড় বিশৃঙ্খল হয়ে উঠল, যানবাহনের আওয়াজে ও তাদের মধ্যে দিয়ে যাতায়াতকারী লোকজনের পথ তৈরি করে নেওয়ার চেষ্টায়। পরিবেশটি দাঁড়াল নতুন বাড়ি তৈরির জন্যে ঝনঝন দুমদাম শব্দমুখর উঠানের মতই। শেষ অবধি স্টেডিয়ামে ঢুকল ১৬ ০০০ দর্শক। ইংল্যাণ্ডের ফুটবল লীগ্ পরিচালনার বয়েসের মাপে অধিক বয়সী হলেও জর্জ রিডার তার জীবনের শেষবারের মত দায়িত্ব নিলেন খেলা পরিচালনার।

উরুগুয়ে ঘিগিয়া এবং সায়াফিনোর মত বহু খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করেছে, যারা পরে ইতালিতে খুব নাম করেছিলেন। ওরা প্রথমার্ধে শুধু ঠেকা দিয়ে গেছে। ব্রাজিল, যারা ইতিপূর্বে অতি দ্রুত তালে সুইডেন ও স্পেনকে হেনস্থা [illegible] সেই উদ্দীপিত টিম সর্বক্ষণ আক্রমণ চালালেও আশ্চর্যের কথা উরুগুয়ে গোলের পতন হল না। বেশির ভাগ সময়েই উরুগুয়ের গোলকীপার মাসপোলি 'অলৌকিক' কৌশল দেখালেন

তা সত্ত্বেও হাফ টাইমের পরেই ব্রাজিল [illegible] করে, গোল ফ্রায়াঙ্কা করেছে। এতে সকলেই নিশ্চিন্ত ভাবল এবার ব্রাজিলের বিজয় অনুষ্ঠান এইভাবেই এগোবে।

কিন্তু উরুগুয়ে আকস্মিক উন্নতির মান নিয়ে সাম্য আনল দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে। উরুগুয়ে তার বকেয়া গোলটা শোধ করল ফিনোকে দিয়ে। এতেই ব্রাজিল মুষড়ে পড়ায় তাদের খেলায় প্রাণ ছিল না। দেখা গেল, একদিকে ব্রাজিল খেলোয়াড়দের মানসিকতা তলিয়ে যাচ্ছে অন্য দিকে উরুগুয়ে শুরু করছে দারুণভাবে খেলতে। খেলা ভাঙার দশ মিনিট আগে ঘিগিয়া যে গোলটি করল তাতেই উরুগুয়ে জিতল।

যারা জীবনপণ করতে রাজি ছিল এমন কয়েকজন ব্রাজিলি-

য়ানের কাছে পরাজয়ের হতাশা দারুণভাবে বিঁধল। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এই খেলাকে ওয়ার্ল্ড কাপের সর্বাপেক্ষা উত্তেজনাকর খেলা হিসাবে বরণ করেন। সামগ্রিকভাবে কাপের বিচারে সবগুলি প্রতিযোগিতায় মোটামুটি ভালই খেলা হয়েছে। বাইশটি ম্যাচে ছিয়াশিটি গোল হওয়ায় স্কোরের (১৯৩৮ প্রতি খেলায় গোলের হার ছিল ৪·৬৬, আঠারটি খেলায় চুয়াল্লিশটি গোল হয়েছিল) মান ছিল উঁচুতেই। প্রতি ম্যাচে গড়ে চার গোলের কিছু কম।

তখনো পর্যন্ত যেমন ছিল তাতে ক্যাটেনাসিওর কথা ভাবা হয়নি।

খেলার ফলাফল

১৯৫০

ব্রাজিল

পুল ১

ব্রাজিল—৪ = অ্যাদেমির (২) জেয়ার, বালতাজার
মেক্সিকো : ০

যুগোশ্লাভিয়া : ৩ = তোমাসেভিক (২) অগনানোভ
সুইজারল্যাণ্ড : ০

যুগোশ্লাভিয়া : ৪ = কেইকউস্কি (দ্বিতীয়), (২) বোবক, তোমাসেভিক
মেক্সিকো : ১ = ক্যাসারিন

ব্রাজিল : ২ = অ্যালফ্রেডো, বালতাজার
সুইজারল্যাণ্ড : ২ = ফ্যাটন, তামিনি

ব্রাজিল : ২ = অ্যাদেমির, জিজিনহো
যুগোশ্লাভিয়া : ০

সুইজারল্যাণ্ড :   ২ = ব্যাদার, ফ্যাটন
মেক্সিকো :   ১ = ভেলাক্কুইজ

কে ? কোথায় ?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
ব্রাজিল	৩	২	১	০	৮	২	৫
যুগোশ্লাভিয়া	৩	২	০	১	৭	৩	৪
সুইজারল্যাণ্ড	৩	১	১	১	৪	৬	৩
মেক্সিকো	৩	০	০	৩	২	১০	০

পুল ২

স্পেন :   ৩ — বাসোরা (২), জারা
যুক্তরাষ্ট্র :   ১ — সুজা

ইংল্যাণ্ড :   ২ — মর্টেনসেন, ম্যানিয়ন
চিলি :   ০

যুক্তরাষ্ট্র :   ১ = গেটজেন্স
ইংল্যাণ্ড :   ০

স্পেন :   ২ = বাসোরা, জারা
চিলি :   ০

স্পেন :   ১ = জারা
ইংল্যাণ্ড :   ০

চিলি ঃ ৫ = ক্রেমাশি (৩), প্রিটো, রবলেডো
যুক্তরাষ্ট্র ঃ ২ = পারিয়ানি, সুজা (ছোট) (পেনাল্টি)

কে ? কোথায় ?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
স্পেন	৩	৩	০	০	৬	১	৬
ইংল্যাণ্ড	৩	১	০	২	২	২	২
চিলি	৩	১	০	২	৫	৬	২
যুক্তরাষ্ট্র	৩	১	০	২	৪	৮	২

পুল ৩

সুইডেন ঃ ৩ = জেপসন (২), এণ্ডারসন
ইতালি ঃ ২ = ক্যারাপেলেস, মুসিনিলি

সুইডেন ঃ ২ সাণ্ডকুইস্ট, পামার
প্যারাগুয়ে ঃ ২ = লোপেজ (এ) লোপেজ (এফ)

ইতালি ঃ ২ ক্যারা পেলেজ, পাণ্ডোলফিনি
প্যারাগুয়ে ঃ ০

কে ? কোথায় ?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
সুইডেন	২	১	১	০	৫	৪	৩
ইতালি	২	১	১	০	৪	৩	৩
প্যারাগুয়ে	২	০	১	১	২	৪	২

পুল ৪

উরুগুয়ে ঃ ৮—সায়াফিনো (৪), মিগুয়েজ (২), ভাইদাল, ঘিগিয়া

বলিভিয়া ঃ

কে ? কোথায় ?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
উরুগুয়ে	১	১	০	০	৮	০	২
বলিভিয়া	১	০	০	১	০	৮	০

ফাইনাল পুল

উরুগুয়ে ঃ ২ = ঘিগিয়া, ভ্যারেলা
স্পেন ঃ ২ = ব্যাসোরা (২)

ব্রাজিল ঃ ৭ = অ্যাদেমির (৪), চিকো (২), ম্যানেকা
সুইডেন ঃ ১ = অ্যাণ্ডারসন (পেনাল্টি)

উরুগুয়ে ঃ ৩ = মিগুয়েজ (২), ঘিগিয়া
সুইডেন ঃ ২ = পামারা, সাণ্ডকুইস্ট

ব্রাজিল ঃ ৬ = চিকো (২), জেয়াব (২), জিজিনহো, পারা (নিজ গোলে)
স্পেন ঃ ১ = ইগোয়া

সুইডেন ঃ ৩ জনসন, মেলবার্গ, পামার
স্পেন ঃ ১ = জারা

উরুগুয়ে ঃ ২ = সিয়াফিনো, ঘিগিয়া
ব্রাজিল ঃ ১ = ফ্রায়াকা

সবশেষে কে ? কোথায় ?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্ব	বিঃ	পয়েন্ট
উরুগুয়ে	৩	২	১	০	৭	৫	৫
ব্রাজিল	৩	২	০	১	১৪	৪	৪
সুইডেন	৩	১	০	২	৬	১১	২
স্পেন	[illegible]	০	১	২	৪	১১	১

১৯৫৪

প্রত্যাশার তুঙ্গে হাঙ্গেরী

যদি ব্রাজিলকে ১৯৫০'এর ওয়ার্ল্ড কাপ-এর সম্ভাব্য চাম্পিয়ন বলে ধরা হয় তাহলে ১৯৫৪'এ জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে হাঙ্গেরিও সুনিশ্চিত ছিল প্রায় প্রস্তর প্রাচীরের মত। এর আগের চার বছর তারা নিজেদেরকে শুধুমাত্র কুশলী, প্রেরণাদায়ক টিম হিসাবেই প্রমাণ করেনি, এও প্রমাণ রেখেছিল তারা অনেক এগিয়ে গেছে। টানা চার বছর ধরে ইউরোপের সব দেশের সঙ্গে মুখো-মুখি হয়েও হাঙ্গেরি থেকেছে অপরাজিত। ওয়েম্বলিতে ইংল্যাণ্ডকে ৬-৩ গোলে গোহারেন দিয়ে তারই পুনরাবৃত্তি করেছে বুদাপেস্তে ৭-১ গোলে হারিয়ে। হাঙ্গেরির প্লেয়ারদের মধ্যে যাদের সবসময়েই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে তুলনা করা হবে তাঁরা ছিলেন—বোজিক, পুসকাস, হিদেকুটি ও কোজিস।

হাঙ্গেরি তৈরী হয়েছে অতি সাবধানে, সবার আগে ১৯৫২'র ওলিম্পিক ফুটবলে জেতার উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছে একটি টিম। ওলিম্পিকে জয়লাভের পর ঐ একই দল বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি চালায়। প্রচুর আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা সত্ত্বেও পরাজয় এড়াতে হাঙ্গেরিয়নরা একটি করে বিশ্রামের দিনও বেছে নিয়েছিল।

সুইজারল্যাণ্ডের মাটিতে ওরা ছাড়া অন্য কোন দল ওয়ার্ল্ড কাপ জিততে পারে এই রকম ধারণা কোন ফুটবল ছাত্রের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। ভাবনার একমাত্র প্রশ্ন ছিল—দ্বিতীয় স্থান পাবে কে? লোকে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড দুই ব্রিটিশ টিমের কথা ভাবলেও উভয়ের মধ্যেই কোন সম্ভাব্য বিজয়ীর লক্ষণ ছিল না। জার্মানি 'পশ্চিম জার্মানি' নাম দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেও বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী

কালের আন্তর্জাতিক ফুটবল মহলের উঁচু মানের দিক থেকে ওদের নেহাতই নতুন ঠেকেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার তুই টিম ব্রাজিল ও উরুগুয়ের মধ্যে বোধহয় উরুগুয়েই ছিল অধিকতর শক্তিশালী। কিন্তু কোন টিমই হাঙ্গেরির ধারে কাছে ঘেঁষতে পারল না।

সত্যিই হাঙ্গেরি বাস্তবে বিজয়ী না হলেও তারা নৈতিক দিক থেকে জয়ী হয়েছে। ওয়ার্ল্ড কাপে খেলার জন্যে যে ষোলটি টিম সুইজারল্যাণ্ডে গিয়েছিল তাদের মধ্যে হাঙ্গেরি ছিল সবার সেরা। এই আসরেই চালু হয় বিশ্বফুটবল খেলা দেখার নতুন মাধ্যম টেলিভিশন। ইউরেভিশন আগেই চলছিল, ফলে তখনো ইউরোপের যে সব জায়গায় টেলিভিশন যায়নি সেখানেও সুইজারল্যাণ্ডের শহরে অনুষ্ঠিত খেলাগুলো বেতারে প্রচারিত হয়েছে।

অভিনব বাছাই ব্যবস্থা

হাঙ্গেরি প্রথম রাউণ্ড পুলের খেলায় হেরে ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে বিদায় নিয়েছে। এই খবরটা শুনতে অদ্ভুত লাগে তাই ষোলটি দেশকে কেমন করে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল তাই ওইরকমের অভাবনীয় বিপর্যয়ের উদাহরণ রেখেই বলছি।

প্রত্যেক গ্রুপে তুটি টিমকে বাছাই তালিকায় রাখা হয়েছিল। তারা শুধু খেলেছে অবাছাই দলের সঙ্গে। সব কোয়ালিফাইং ম্যাচ শেষ করার আগেই বাছাইয়ের আয়োজন হয়েছে। বাছাইয়ের বরাত স্পেনের ভাগ্যেও জুটেছে। একমাত্র সমস্যাই ছিল, স্পেন কোয়ালিফাই করতে পারে কিনা। তারা কয়েকটি খেলায় তুরস্কের সঙ্গে ড্র করার শেষে খেলার তালিকা তৈরী করা হয়। এই জটিল ব্যাপারটা তখনো ছিল। সুতরাং তুরস্ক বাছাই দেশ হিসাবে সুইজারল্যাণ্ডে হাজির হয়েছে।

তুরস্ককে দক্ষিণ কোরিয়া ও পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে দু'নম্বর গ্রুপে রাখা হয়। ওই দুটি দল ও হাঙ্গেরি বাছাই তালিকায় ছিল না। প্রত্যেক গ্রুপে দুটি টিম কোয়ার্টার ফাইনালে থাকায় পরের প্রতিযোগিতা হয় নক আউট ভিত্তিতে। অতি দ্রুত হাঙ্গেরি দক্ষিণ কোরিয়াকে পরিষ্কার ৯-০ গোলে হারিয়ে প্রমাণ করল যে, তাদের নিয়ে দুর্ভাবনার কিছু নেই। এর মাঝে পশ্চিম জার্মানি তুরস্ককে হারিয়ে দিল ৪-১ গোলে।

সুইজারল্যাণ্ডে ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানির সীমান্ত শহর ব্যাসলের 'সেণ্ট জ্যাকব'এর ষ্টেডিয়ামে অতঃপর সাক্ষাৎ হল হাঙ্গেরি ও পশ্চিম জার্মানির মধ্যে। হাজার হাজার জার্মান ভ্রমণকারী খেলা দেখতে আসায় ষ্টেডিয়ামের ভিড় উপছে পড়েছে। একদল উৎসাহী দর্শক একটি ট্রেন ভাড়া করেছিল। তাদের টিকেট না থাকায় ষ্টেডিয়ামের খোলা দিকটায় রেল লাইন বরাবর ট্রেনটিকে এমন ভাবে তারা দাঁড় করিয়ে দিল যেখান থেকে ম্যাচটি ভাল করেই উপভোগ করা যায়।

আউট সাইড রাইট. বুদাইয়ের বদলে টথকে নিয়ে হাঙ্গেরি তার শক্তিশালী টিমটি ঘোষণা করেছে। গোলে গ্রসিক্স, দুই ফুলব্যাক বুজানস্কি ও ল্যাণ্টোস, সেণ্টার ব্যাক ও ডিফেনসিভ লেফট হাফে লোরাণ্ট ও জাকেরিয়া. উইথড্রল সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিদেকুটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে বোজিক হল মিডফিল্ড রাইট হাফ। এবং. সচল সম্মুখ ভাগের খেলোয়াড় চতুষ্টয় টথ, কোজিস, পুসকাস ও জিবর।

পশ্চিম জার্মানির টিম ঘোষিত হয়েছে তাদের সমর্থকদের বাঁশি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে। তুরস্কের বিরুদ্ধে যে টিমটি ভাল খেলেছিল তাদের থেকে জায়গা পাল্টে গোটাগুটি দশ জনকেই কোচ সেপ হার্বার্জার বদল করেছে। জার্মান সমর্থকদের কাছে এটা ছিল আত্মহত্যার সামিল।

তবুও সেপহার্বার্জার একজন ঝানু ধূর্ত শৃগাল, সে যুক্তি দেখিয়েছে ঃ হাঙ্গেরিকে হারানোর আশা কম, তুরস্ক দক্ষিণ কোরিয়াকে হারাবে, (সত্যিই তারা ৬-০ গোলে হারিয়েছে)। সুতরাং কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার অধিকারের জন্য তুরস্ক ও পশ্চিম জার্মানির মধ্যে খেলা হবে। সেপ এতেই নিশ্চিত ছিল। প্লে-অফ খেলায় তার টিম জিতবেই, এই কারণেই হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে ম্যাচটি বিসর্জন দিতে সে তৈরি হয়েছে। সেপই একমাত্র জার্মান যে জার্মানি ৮-৩ গোলে হাঙ্গেরির হাতে বিধ্বস্ত হয়েছে শুনে হতাশ হল না। ফেরেঙ্ক পুসকাস পায়ে গুরুতর জখম হওয়ায় ওই খেলায় জেতার জন্যে যে চড়া দাম হাঙ্গেরিকে দিতে হয়েছে তা ভেবে তারা গভীর চিন্তান্বিত হয়েছে। এই আঘাত পাওয়ার জন্যই হাঙ্গেরিকে ১৯৫৪'এর ওয়ার্ল্ড কাপ হারাতে হয়েছিল।

প্লে-অফ খেলায় পশ্চিম জার্মানি প্রত্যাশামতই তুরস্ককে ৭-২ গোলে পরাজিত করলে একুনে ওই গ্রুপের গোল সংখ্যা দাঁড়াল একচল্লিশ—এটাই হল এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল কথা। সবসুদ্ধ ছাব্বিশটি ম্যাচে গোল হয়েছে একশো চল্লিশটি। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুগোশ্লাভিয়ার ১-০ গোলে জয়লাভ এবং ওই সমান সংখ্যক গোলে স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার জয়লাভের ফলাফলই সবচেয়ে কম গোলের খেলা।

স্কটল্যাণ্ড ওয়ার্ল্ড কাপে সুবিধা করতে পারেনি। সেই প্রথম স্কটল্যাণ্ড শেষ ষোলদলে ঢুকলেও কারোরই স্কটল্যাণ্ডকে নিয়ে মাথা ব্যথা ছিল না। ওখানকার স্থানীয় রেঞ্জার্স ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপকে ততো আমল না দিয়ে বেরিয়ে এল ক্লাবের খেলা খেলতে। এটা খুবই কম আশ্চর্যের যে একটিও গোল বা ওদের নামের পাশে কোন পয়েন্ট যোগ না করেই স্কটল্যাণ্ড বিদায় নিল প্রথম রাউণ্ডেই।

স্কটল্যাণ্ড অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে খারাপ খেলেনি। তবে তারা উরুগুয়ের বিরুদ্ধে চরম দুর্ভোগে পড়েছিল। সান্তামারিয়া (পরে যে রিয়েল মাদ্রিদের খেলোয়াড় হয়েছে) আব্রাদে এবং শিয়াফিনোর (মিলানের হয়ে পরে খেলেছে) স্কটল্যাণ্ড একবারও সুবিধা করতে পারেনি এবং তারা যে মাত্র ৭-০ গোলে হেরে পার পেয়েছে এটা তাদের সৌভাগ্যই বলা যেতে পারে। চতুর্থ গ্রুপে ইতালির সঙ্গে রাখা হয়েছিল ইংল্যাণ্ডকে। বাছাইয়ের বাইরে ছিল বেলজিয়াম ও সুইজারল্যাণ্ড। বেলজিয়াম প্রথম খেলে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। খেলাটি হয় ব্যাসলেতে। যদিও ইংল্যাণ্ড প্রথমেই এক গোলে পিছিয়ে যায় তাহলেও তারা সিকি ঘণ্টা বাকি থাকতেই এগিয়ে থাকে ৩-১ গোলে, যতক্ষণ না বেলজিয়াম আচমকা আক্রমণ করে দুটো গোল করেছে ততোক্ষণ ইংল্যাণ্ড ছিল জয়লাভে সুনিশ্চিত। পুনরায় অতিরিক্ত সময়ে দুপক্ষই গোল করেছে। কিন্তু ৪-৪ গোলে ড্র করে ইংল্যাণ্ড একটি পয়েন্ট হারায়।

অনবদ্য স্ট্যানলি ম্যাথুজ

ঘটনাচক্রে ওই ম্যাচেই ষ্ট্যানলি মাথুজ ইংলণ্ডের হয়ে খেলতে নেমে খুবই ভাল খেলেন। ওই খেলার ধারাবিবরণীতে ওকে 'সেন্ট ম্যাথুজ' বলে বর্ণনা দিয়েছিল বলেই হয়তো উনি এমনি খেলা খেলেছেন।

যদি ইংল্যাণ্ড একটি মূল্যবান পয়েন্ট খোয়াতো তবে ওই ধরনেরই খারাপ হতই। উভয়েই সুইজারল্যাণ্ডের কাছে হারায় গ্রুপের দরজা সকলের কাছে খুলে যায়। সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় খেলায় ইংল্যাণ্ড স্বভাবতই জেতে ২-০ গোলে। তখন ইংল্যাণ্ডের ফুটবল ইতিহাসে এও লেখা হয় যে, ওই ম্যাচে বিলি রাইটকে উইং থেকে হাফে পরিবর্তন করা হয়। এতেও সুইজারল্যাণ্ডের পরাজয়ের

মধ্যেই সমাপ্তি ঘটল না। ওদের বিরুদ্ধে প্লে-অফ খেলতে হল। সপাটে ৪-১ গোলে জিতে সুইজারল্যাণ্ড কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার রাস্তা তৈরী করে নেয়।

সুইজারল্যাণ্ড কোয়ার্টার ফাইনালে অসাধারণ ভালো খেলেছে। অবিশ্বাস্য অকউইর্ক তখনও অস্ট্রিয়ান টিমে ছিল। অকউইর্ক বেরকণ দৌড়ত, এজন্যে সবাই ওর নাম রেখেছিল 'ক্লক ওয়ার্ক'। হ্যানাপ্পি, হ্যাপেল, স্টোজাসপাল, পবস্ত, প্রমুখ বড় খেলোয়াড়রাও দলে ছিল। দলগত ভাবে ওরা ছিল এক দুর্ধর্ষ টিম। কুড়ি মিনিটে তিন গোল চাপালেও ওই অতর্কিত সূচনাতে ম্যাচটির ভাগ্য নির্ধারিত হল না। দুরবস্থায় ব্যস্ত হয়ে অস্ট্রিয়া [illegible] তিনটি গোল শোধ দেয় তিন মিনিটে, চার মিনিটে [illegible] পাঁচে। ৩-০ গোলে পিছিয়ে থেকেও সাত মিনিটের মধ্যে খেলার মোড় ঘুরিয়ে [illegible] গোলে [illegible]।

অভাবনীয় অস্ট্রিয়া

অন্য মাঠে যারা খেলা দেখছিল তারা এই খবর শুনে প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি। হাফটাইমে ৫-৪ গোলের তফাতে অস্ট্রিয়া জিতছে খবর টাঙানো হলেও কেউ সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করেনি। সবশেষে সকলকেই বিশ্বাস করতে হয়েছে, ৭-৫ গোলের ব্যবধানে অস্ট্রিয়া জিতেছে।

ওই খবর বেশ সাড়া জাগালেও ১৯৫৪ সালের ওয়ার্ল্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ছিল আরও চমকপ্রদ ঘটনায় ভরা। বাসেলেতে একই মাঠে উরুগুয়ের কাছে স্কটল্যাণ্ডের ৭-০ গোলের পরাজয়ে ইংল্যাণ্ড ভাবছিল যে যুৎসই জবাব দিতে হবে। খেলার সূচনায় পাঁচ মিনিটের ভিতরেই ইংল্যাণ্ড এক গোলে পিছিয়ে থেকেও ম্যাথুজের দৃঢ়তায় বিপদ এড়িয়ে টিম তুঙ্গ মেজাজে খেলতে থাকে।

ন্যাটা লফ্‌টহাউস গোল শোধ করতেই ইংল্যাণ্ড চমকপ্রদ ফুটবল খেলতে সুরু করেছে। জেতার আশা উজ্জ্বল হয়ে উঠতেই ফুটবলে যেমন ঘটে তেমনি সামান্য প্রত্যাশিত বিপর্যয় ঘনিয়ে এল। উরুগুয়ে আবার গোল করে বিরতির সময় এগিয়ে থাকল ২-১ গোলে।

ইংল্যাণ্ডের পরাজয়ের যে কোনো কথাই উঠতে পারে না, তারা তা প্রমাণ করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। যেমনি দেখা গেল যে উরুগুয়ের খেলোয়াড় খোঁড়াচ্ছে অমনি ইংল্যাণ্ডের প্রত্যাশা জেগে উঠছে। কিন্তু উরুগুয়েব তৃতীয় গোলের জবাবে ফিনি ভাল খেলে আবার একটি গোল করলেও অলৌকিক কিছু ঘটেনি। চতুর্থ গোল হওয়ায দঃ আমেবিকানদেব পক্ষে খেলাব মীমাংসা হয়েছে।

বার্নের যুদ্ধ

উরুগুয়ে ৪ ইংল্যাণ্ড ২, খেলাটি কিন্তু হয়েছিল দেখাব মত। হাঙ্গেবি ৪, ব্রাজিল ২, খেলাটি ছিল বড়ই পীড়াদায়ক। খেলাটি ইতিহাসে জায়গা পেয়েছে "বার্ণের যুদ্ধ" নামে। ওই খেলাতেই তিনজন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের কবে দেওয়া হয়। হ্যালিফ্যাক্স আর্থাব এলিসি'র বেফারীইংয়ের জন্যেই সেদিনটা বড রকমের দাঙ্গা থেকে রেহাই পেয়েছিল। ভারি মজার ব্যাপার যে, মারামারির মধ্যেও চমৎকার ফুটবল খেলা হয়েছিল।

প্রথম দশ মিনিটে হাঙ্গেরি ব্রাজিলেব বিরুদ্ধে দু'বার গোল করে। পরে বিরতির আগে পেনাল্টি থেকে আবাব গোল করে হাঙ্গেরি। দ্বিতীয়ার্ধেই গোলমাল বাধে। হাঙ্গেরি খেলার দ্বিতীয় গোলটি দিয়ে ৩-১ গোলে এগোয়। এতে ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা পরাজয়ের গ্লানিতে উত্তরোত্তর হিংস্র হয়ে ওঠে। কিন্তু কোন মতেই তারা আর গোল করতে পারল না। এর মধ্যে আবার কিছুক্ষণ ঝগড়া হওয়ায় বোজিক (হাঙ্গেরি) ও নিল্টন স্যাণ্টোসকে (ব্রাজিল) মাঠ থেকে বার করে দেওয়া হয়।

রেফারির চোখের আড়ালে লাথালাথি ঘুঁষোঘুঁষি, মারামারি এত সহজ ব্যাপার হয়ে ওঠে যে খেলার মান নেমে গিয়ে জঘন্য স্তরে পৌঁছয়। হাম্বার্টোকেও মাঠ থেকে বেরকরা হয় এবং শেষ মিনিটে হাঙ্গেরি একটি গোল করে, কিন্তু উত্তেজনা তখন চরমে। দর্শকেরা জানতেই পারেনি কি করে গোল হল।

বিশ্বকাপে উরুগুয়ের প্রথম পরাজয়

সেমিফাইনালের প্রর্যায়, বার্নের মাঠে খেলায় চোট পাওয়া পুসকাস তখনো আহত। ফলে ওকে ছাড়াই হাঙ্গেরিয়ানদের দুর্দান্ত উরুগুয়েব বিরুদ্ধে নামতে হয়েছে। নৈপুণ্যে ও উত্তেজনায় ভরা এই খেলাটি এত উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছল যে একে সর্বকালেব ফুটবল ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় ম্যাচ বলা যেতে পারে। একসময় ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে হাঙ্গেরি ৪-২ গোলে জিতলেও খেলা চলেছিল অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত। দু'দলে এমন ভাবে সমান সমান খেলেছিল যে একজন যে হারবে তা বোঝা যাচ্ছিল না তবুও একদলকে হারতে হয়েছে। এই দুর্ভাগা দলটি উরুগুয়ে, উন্নত ফুটবল খেলাটি দেখার সময় সকলেই এত মসগুল ছিল যে কেউই ধরতে পারেনি যে তখন পর্যন্ত বিশ্বকাপে'র যত খেলা হয়েছে তাতে সর্বপ্রথম উরুগুয়ে পরাজিত হবে।

এর পরেই ফাইনাল। লোকে পঃ জার্মানির জয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত। অথচ কেউ ঠিক করতে পারল না হাঙ্গেরিকে কিভাবে পশ্চিম জার্মানি হারাবে।

হাঙ্গেরির হার জর্মানির জয়

হাঙ্গেরিয়ানরা এই ফাইনাল উপভোগ করার জন্যে তাদের স্ত্রী, পুত্র কন্যা কেউবা তাদের প্রেয়সীকে পর্যন্ত বার্নে নিয়ে এসেছিল। তাদের সকলের মনে একটা আশা ছিল, হাঙ্গেরি জিতলে তারা একপক্ষের মত ছুটি ভোগ করবে। হাঙ্গেরিয়ানরা তাদের জয়লাভ সম্বন্ধে আগে থেকেই ছিল পরম নিশ্চিত।

দেখা গেছে মঞ্চ প্রস্তুত, নাটকের প্রতিটি দিক উন্মোচিত কিন্তু প্রত্যাশিত জয়লাভ পরাজয়ে পরিণতি পেল। উচ্চাশার সমাধি ঘটেছে।

ফাইনাল খেলার দিন সকাল থেকেই মুষল ধারে বৃষ্টি হলেও বার্ণের ওয়াঙ্ক ডফা স্টেডিয়ামের মাঠের কোন ক্ষতি হয়নি।

ফাইনালের জন্য অসমর্থ পুসকাসকে হাঙ্গেরি দলে নেওয়া হলেও এই বেহিসেবী চালে কাজ হয়নি। পুসকাস একেবারেই সুস্থ ছিল না। যখন চিপ করতে কুঁজো হচ্ছিল তখনি সে অসোয়াস্তি বোধ করেছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে পুসকাসকে কাপ জয় করার জন্যেই খেলানো হয়েছিল। কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। হাঙ্গেরি পারল না।

অসুস্থ বা সুস্থ যাই হোক পুসকাস পাঁচ মিনিটের মাথায় গোল করে হাঙ্গেরিকে এগিয়ে দিয়েছে। এর কয়েক মিনিট বাদেই দ্বিতীয় গোলটি করেছে জিবর। মনে হল হাঙ্গেরি যেন খেলাটিতে জিতেই গেছে। এর জবাবে জার্মানী চটপট দুটি গোল করে হাফ টাইমের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলল।

দ্বিতীয়ার্ধে হাঙ্গেরি যথার্থ ই জার্মানিকে নাচার করলেও বল কিন্তু সহজে জালে ঢুকল না। শেষ পাঁচ মিনিটে হাঙ্গেরি দুবার বিপাকে পড়ল। প্রথমত হাঙ্গেরি একটিবার আত্মরক্ষার চালে ভুল করে

জার্মানিকে তৃতীয় গোলটি করার সুযোগ করে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত ওয়েলসের লাইন্সম্যান মার্ভিন গ্রিফিত যতক্ষণ পর্যন্ত না অফ স্নাইডের অজুহাতে ফ্ল্যাগ উচিয়ে ধরল ততক্ষণ দেখা গেল পুসকাস চমৎকার ভাবে এগিয়ে শেষ পর্যন্ত গোল শুধে দিচ্ছে। তখনকার শ্রেষ্ঠ টিম হাঙ্গেরি চার বৎসরের মধ্যে সেই প্রথম পরাজয় বরণ করল।

রেফারি বাঁশি বাজিয়ে খেলা শেষের সংকেত দেওয়ার কয়েক সেকেণ্ড পরেই মনে হল গ্রসিক্স রেফারিকে মারতে যাচ্ছে, আসলে হাঙ্গেরিয়ানরা এই ব্যাপারটা পরস্পর খেলোয়াড়চিত দৃষ্টি ভঙ্গিতে মেনে নিয়েছে। পুসকাস জার্মান ক্যাপ্টেনকে অভিনন্দন জানিয়েছে। হাঙ্গেরির কোচ গুস্তাভ সিবেস, জার্মান কোচ সেপ হার্বারজারের সঙ্গে করমর্দ্দন করেছে। দেখা গেল জার্মান খেলোয়াড় তাদের ম্যানেজারকে কাঁধের উপরে তুলে নিয়ে সানন্দে মাঠ ছেড়ছে।

অনামী খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত জার্মান ফুটবল টিম সেই সর্বপ্রথম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুটবল ট্রফিটি পেল!

প্রথম রাউণ্ডে সেপ হার্বারজারের চতুর টিম পরিচালনা এবং পুসকাসের সেই চোট লাগা, দুটো ব্যাপারই প্রধানত কার্যকরি হয়ে উঠেছে।

১৯৫৪

সুইজারল্যাণ্ড

পুল ১

যুগোশ্লাভিয়া : ১ মিলুটিনোভিক
ফ্রান্স : ০

ব্রাজিল : ৫ পিঙ্গা (২) বালতাজার, ডিডি, জুলিনহো
মেক্সিকো : ০

ফ্রান্স : ৩ ভিনসেণ্ট, কার্ডেনাস (নিজগোলে) কোপা (পেনাল্টি)
মেক্সিকো : ২ নারাঞ্জো, বালক্যাজার

ব্রাজিল : ১ ডিডি
যুগোশ্লাভিয়া : ১ জেবেক (অতিরিক্ত সময়ে)

কে ? কোথায় ?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
ব্রাজিল	২	১	১	০	৬	১	৩
যুগোশ্লাভিয়া	২	১	১	০	২	১	৩
ফ্রান্স	২	১	০	১	৩	৩	২
মেক্সিকো	২	০	০	২	২	৮	০

পুল ২

হাঙ্গেরি : ৯ কোজিস (৩) পুসকাস (২) প্যালোটাস (২) জিবর, লাণ্টোস
কোরিয়া : ০

পঃ জার্মানি : ৪ ক্লদ, মোরলক, শেফার, অটমার ওয়াল্টার
তুরস্ক : ১ স্নুয়াট

হাঙ্গেরি : ৮ কোজিস (৪) হিদেকুটি (২) পুসকাস, টথ
পঃ জার্মানি : ৩ পাফ, হেরম্যান, রান

তুরস্ক : ৭ বারহান (৩) সুয়াট (২) এরোল, লেফটার
কোরিয়া : ০

প্লে—অফ

পঃ জার্মানি : ৭ মোরলক (৩) শেফার (২) অটমার ওয়াল্টার, ফ্রিৎস ওয়াল্টার
তুরস্ক : ২ মুস্তাফা, লেফটার

কে ? কোথায় ?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
হাঙ্গেরি	২	২	০	০	১৭	৩	৪
পঃ জার্মানি	২	১	০	১	৭	৯	২*
তুরস্ক	২	১	০	১	৮	৪	২
কোরিয়া	২	০	০	২	০	১৬	০

* তুরস্কের সঙ্গে প্লে—অফ খেলার পর পঃ জার্মানি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে।

পুল ৩

অষ্ট্রিয়া ঃ ১ প্রবস্ত
স্কটল্যাণ্ড ঃ ০

উরুগুয়ে ঃ ২ মিগুয়েজ, সিয়াফিনো
চেকশ্লোভাকিয়া ঃ ০

অষ্ট্রিয়া ঃ ৫ প্রবস্ত (৩) ষ্টোজাসপাল (২)
চেকশ্লোভাকিয়া ঃ ০

উরুগুয়ে ঃ ৭ বর্জেস (৩) অ্যাবাদি (২) মিগুয়েজ (২)
স্কটল্যাণ্ড ঃ ০

কে ? কোথায় ?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
উরুগুয়ে	২	২	০	০	৯	০	৪
অষ্ট্রিয়া	২	২	০	০	৬	০	৪
চেকশ্লোভাকিয়া	২	০	০	২	০	৭	০
স্কটল্যাণ্ড	২	০	০	২	০	৮	০

পুল ৪

ইংল্যাণ্ড ঃ ৪ ব্রডিস (২) লফটহাউস (২)
বেলজিয়াম ঃ ৪ অ্যানোউল (২) কপেন্স, ডিকিন্সন (নিজগোলে)

সুইজারল্যাণ্ড ঃ ২ ব্যালামান, হিউজি
ইতালি ঃ ১ বনিপার্ট

ইংল্যাণ্ড ঃ ২ মুলেন, উইলশ্

সুইজারল্যাণ্ড ঃ ০

ইতালি ঃ ৪ প্যাণ্ডলফিনি (পেনাল্টি) গ্যালি, ফ্রিগনানি, লরেঞ্জি

বেলজিয়াম ঃ ১ অ্যানোউল

প্লে-অফ

সুইজারল্যাণ্ড ঃ ৪ হিউজি (২) ব্যালাম্যান, ফ্যাটন

ইতালি ঃ ১ নেস্তি

কে ? কোথায় ?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
ইংল্যাণ্ড	২	১	১	০	৬	৪	৩
সুইজারল্যাণ্ড	২	১	০	১	২	৩	২*
ইতালি	২	১	০	১	৫	৩	২
বেলজিয়াম	২	০	১	১	৫	৮	১

* ইতালির সঙ্গে প্লে-অফ খেলার পর সুইজারল্যাণ্ড কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে।

কোয়ার্টার ফাইনাল

অষ্ট্রিয়া ঃ ৭ ওয়েগনার (৩) কোর্নার (২) অকউইর্ক, প্রবস্ত।

সুইজারল্যাণ্ড ঃ ৫ ব্যালাম্যান (২) হিউজি (২) হ্যানাপ্পি (নিজগোলে)

হাঙ্গেরি ঃ ৪ কোজিস (২) হিদেকুটি, ল্যাণ্টোস (পেনাল্টি)

ব্রাজিল ঃ ২ জালমা স্যাণ্টোস (পেনাল্টি) জুলিনহো।

উরুগুয়ে ঃ ৪ বর্জেস, ভ্যারেলা, শিয়াফিনো, অ্যামব্রোইস।
ইংল্যাণ্ড ঃ ২ লফটহাউস, ফিনি।

পঃ জার্মানি ঃ ২ হোর্ভাট (নিজ গোলে) রান
যুগোশ্লাভিয়া ঃ ০

সেমিফাইনাল

হাঙ্গেরি ঃ ৪ কোজিস (২) জিবর, হিদেকুটি
উরুগুয়ে ঃ ২ হোবার্গ (২) (অতিরিক্ত সময়ে)

পঃ জার্মানি ঃ ৬ ফ্রিৎস ওয়াল্টার (২) (উভয় গোলই পেনাল্টি থেকে) ওটমার ওয়াল্টার (২) মোরলক, শেফার।
অষ্ট্রিয়া ঃ ১ প্রবস্ত

তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণায়ক খেলা

অষ্ট্রিয়া ঃ ৩ ষ্টোজাস পাল (পেনাল্টি) ক্রুজ (নিজ গোলে), অকউইর্ক
উরুগুয়ে ঃ ১ হোবার্গ।

ফাইনাল

পঃ জার্মানি ঃ ৩ রান (২) মোরলক
হাঙ্গেরি ঃ ২ পুসকাস, জিবর।

সবশেষে কে? কোথায়?

প্রথম—পঃ জার্মানি, দ্বিতীয়—হাঙ্গেরি, তৃতীয়—অষ্ট্রিয়া, চতুর্থ—উরুগুয়ে

১৯৫৮

বিশ্ব ফুটবলে পেলে'র প্রবেশ

ফিফা'র মোট সদস্যের মধ্যে ৫৩টি দেশ ষষ্ঠ বিশ্বকাপে যোগ দেওয়ায় একটি রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। সব ম্যাচে যোগ দিয়েছিল ৪৬টি দেশ। ওদের মোট উননব্বইটি ম্যাচ দেখতে হাজির হয়েছিল ৪০ লক্ষ লোক। তবে লিপজিগের কোয়ালিফাইং রাউণ্ডের ৩টি খেলায় ৩ লক্ষ ১ দর্শকের উপস্থিত সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে।

ফুটবলে ১৯৫৮ স্মরণে থাকবেই। এই বছরেই ব্রাজিলের একটি ছোট শহরের এডসন অ্যারান্টেস ডু নাসিমেণ্টো নামে পরিচিত তরুন পেলের সন্ধান মেলে।

পেলের জন্ম হয়েছিল ২১শে অক্টোবর ১৯৪০ সালে। যখন সে প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে নামে তখন তার বয়স ম'ত্র সতের বছর। তবুও কয়েক বছরের মধ্যে সে সর্বকালের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে উঠে বসেছে।

পেলের অবিশ্বাস্য সফলতা ফ্রান্সের অন্য একজন দুর্দান্ত ফুটবলার জঁ্যাতে ফতঁ্যাকেও দাবিয়ে দেয়। ফ্রান্সের তৃতীয় স্থান অর্জনে যারা সবচেয়ে কার্যকরি হয়েছিল সেই তাকলাগানো 'ফতঁ্যা—কোপা' মানিক জোড়ের গোল দেওয়ার শরিক ছিল ফতঁ্যা। মিড ফিল্ডম্যান রেমণ্ড কোপা ছিল চতুর,দক্ষ,জোরালো বুদ্ধিসম্পন্ন ধুরন্ধর খেলোয়াড়। ফতঁ্যা এমনি ষ্ট্রাইকার ছিল যাকে কখনো মিস্ করতে দেখা যায়নি। নরকোপিংয়ের একটি অসাধারণ ম্যাচে প্যারাগুয়েই প্রথম দেশ যারা এই ফুটবল প্লেয়ারের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল। এই টিমটি

ছিল দ্রুত, চতুর ও বিপজ্জনক। কুড়ি মিনিট পরেই প্যারাগুয়ে এগিয়ে যায়। এরপরেই ফন্তঁ্যা আঘাত হেনেছে। কোপার কাছ থেকে পাস পেয়ে দুবারই সে মাঝ বরাবর ছুটে গিয়ে গোল করে। কিন্তু হাফ টাইমের আগেই প্যারাগুয়ে ফলাফল সমান করে ফেলে।

গোলের মালাকার জঁ্যাতে ফন্তঁ্যা

দ্বিতীয়ার্ধের খেলাটিও কম উত্তেজনাপূর্ণ ছিল না। প্যারাগুয়ে পুনরায় এগিয়ে থাকলেও দুমিনিটের মধ্যে ফ্রান্স গোল করে ফলাফল অমীমাংসিত রেখেছে। এরপরেই ঘটল তাজ্জব ব্যাপার। প্যারাগুয়েকে যারা জেতাবে বলে আশা করেছিল হঠাৎ তারা পুরোপুরি ভেঙে পড়ল। আটমিনিটে ফ্রান্স তিনবার গোল করেছে (এর মধ্যে একটি গোল ফন্তঁ্যার মাধ্যমে) এবং শেষ মুহূর্তে আরো একটি হওয়ায় ফ্রান্স ৭—৩ গোলে জয়ী হয়। সুদক্ষ জঁ্যাতে ফন্তঁ্যা তিনটি গোল করে হয় সর্বোচ্চ স্কোরার।

দ্বিতীয় ম্যাচে প্যারাগুয়ে স্কটল্যাণ্ডকে হারায় ৩—২ গোলে এবং একই ফলাফলে ফ্রান্সও পরাজিত যুগোশ্লাভিয়ার কাছে। বলাই বাহুল্য যে ফ্রান্সের দুটি গোলই করেছিল ফন্তঁ্যা। ফ্রান্স ২—১ গোলে স্কটল্যাণ্ডকে হারাতেই ফন্তঁ্যাও একটি গোল করে তার কৃতিত্বের পুনরাবৃত্তি করল। এতে নির্ধারিত হল ফ্রান্স চার পয়েণ্ট পেয়ে আরও ভাল গোলের গড় রেখে কোয়ালিফাইং গ্রুপে শীর্ষস্থান পেয়েছে। ফ্রান্সের মোট এগারটি গোলের মধ্যে ফন্তঁ্যা করেছিল ছ'টি।

স্কটল্যাণ্ড যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে ১—১ গোলে ড্র করে এক পয়েণ্ট পাওয়ায় গ্রুপ থেকে সরে গেছে।

'হিরো' গোলকীপার হ্যারি গ্রেগ

কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের খেলা ছিল উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। ওদের অবস্থা ক্রমেই সঙিন হয়ে ওঠে। আয়ারল্যাণ্ড প্রথম খেলায় চেকশ্লোভাকিয়াকে ১—০ গোলে হারিয়ে সকলকে অবাক করলেও পরের ম্যাচে আর্জেন্টিনার কাছে হারে ৩—১ গোলে। জার্মানির বিরুদ্ধে তৃতীয়বার খেলার দিন সকালে ওদের পয়েন্ট ছিল যথাক্রমে দুই। পশ্চিমজার্মানির তিন। আর্জেণ্টিনার দুই, ও চেকশ্লোভাকিয়ার এক। চেকশ্লোভাকিয়া ৬-১ গোলে আর্জেন্টিনাকে হারানোর ফলে প্লে—অফ খেলায় বাধ্য করার জন্য উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের ম্যাচটি ড্র করার দরকার ছিল। তারা বারবার আঘাতে বিপর্যস্ত হলেও জার্মানদের বিরুদ্ধে তাদের খেলা হয়েছিল বেশ চটকদারি। দুবারই তারা এগিয়ে থাকলেও জার্মানরা ব্যবধান কমিয়ে ফলাফল সমান করে ফেলেছে। এই খেলায় সর্বক্ষণ হিরো ছিল গোলকীপার হ্যারি গ্রেগ। ম্যাচের আগেই ওর কাঁধে চোট লেগেছিল। খেলার সময় পরের পর বেপরোয়া হয়ে গোল রক্ষা করায় ওর কাঁধের সোয়েটার ছিঁড়ে যায়। এবং কাঁধে এত আঘাত লাগে যে খেলা শেষ হতেই মাঠ থেকে সে সোজা হাসপাতালে যেতে বাধ্য হয়েছে।

নেদারল্যাণ্ড একটি পয়েন্ট পাওয়া মানেই চেকশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে মালোর্মেতে একটি প্লে-অফ খেলার আয়োজন। ২—১ গোলে জিতে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড ফলাফল উল্টে ফেলেছে। দুটো গোলই করেছিল পিটার ম্যাকপারল্যাণ্ড। এরমধ্যে দ্বিতীয়টি হয়েছে অতিরিক্ত সময়ের দশম মিনিটে।

অস্তাচলে আর্যাল্যাণ্ড

উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের জারিজুরি এই প্লে—অফ খেলাতেই শেষ হয়েছে। দুদিন পরেই ফ্রান্সের সঙ্গে খেলতে তাদের মালোর্মে থেকে নরকোপিংয়ে যাওয়ার কথা। অদ্ভুত ব্যাপার, তারা ঠিক করল বিমানে যাবেনা।

খেলা আরম্ভ হলে দেখা গেল আয়ার্ল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা ক্লান্ত হয়েও তেতাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত ফ্রান্সকে দাবিয়ে রেখেছে। দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম দিকেই আসে বিপর্যয়কর দ্বাদশ মিনিটের ভয়াবহ ইঙ্গিত। সে সময় ফ্রান্স তিনটি গোল চাপিয়ে দেয়। এর মধ্যে দুটো গোল করল ফন্ত্যাঁ একাই।

সামনে গ্যারিঞ্চা নেপথ্যে পেলে

অতএব ফ্রান্স উঠল সেমিফাইনালে। এবার তাদের খেলতে হবে ব্রাজিলের সঙ্গে, যাদেরকে প্রথম থেকেই সম্ভাব্য বিজয়ী বলে ধরা হয়েছিল। অষ্ট্রিয়া, ইংল্যাণ্ড এবং রাশিয়ার সঙ্গে ব্রাজিলও ছিল চতুর্থ গ্রুপে। তারা সুইডেনে হাজির হয়েছিল দুটি সেরা খেলোয়াড় নিয়ে। এদের মধ্যে গ্যারিঞ্চার কথা আগেই শোনা গিয়েছিল তবে পেলের কথা তখনো কানে আসেনি।

তবুও গ্যারিঞ্চা প্রথম ম্যাচে না খেললেও ব্রাজিল অষ্ট্রিয়াকে সহজেই ৩-০ গোলে হারিয়ে দেয়। এর মধ্যে, মস্কোতে প্রি ওয়ার্ল্ড কাপের খেলায় ইংল্যাণ্ড সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে ড্র করেছিল। তারা গথেনবার্গেও সেই ফলাফলেরই পুনরাবৃত্তি করে। এবার খেলার ফলাফল হল, ২-২ গোলে ড্র। দু গোলে পিছিয়ে পড়েও ইংল্যাণ্ড দু-গোল শোধ করে চমৎকার ভাবে পুনরুজ্জীবিত

হয়েছে। প্রথমে ফর্ত্যা গোল করলেও খেলা শেষের পাঁচ মিনিট আগে পেনাল্টি থেকে ইংল্যাণ্ড গোল শোধ দেয়।

রাশিয়া ২-০ গোলে হারাল অষ্ট্রিয়াকে। এবং সেই গথেন-বার্গে ইংল্যাণ্ড ব্রাজিলকে রুখল গোলশূন্য ফলাফল রেখে। তখনো ব্রাজিলিয়ানরা পেলেকে লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু তবুও তারা সমানে ম্যাচ জিতে চলেছে।

ইংল্যাণ্ডের দরকার ছিল একটি গোল স্কোরারের। ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনাইটেডের জনৈক তরুণ খেলোয়াড় দলে ঢোকানো নিয়ে জোর হৈ চৈ চলে। সেই বছর মিউনিক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়ে সেই অজ্ঞাত ফুটবলারটি এত ভাল খেলেছিল যে তাকে দুমাস বাদেই স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড টিমে খেলার জন্যে ডাকা হল। এরই নাম ববি চার্লটন। আশা করা গিয়েছিল যে বোরাসে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় এবং শেষ খেলায় ববিকে খেলানো হবে।

কিন্তু ওকে নেওয়া হল না। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে যে টিম খেলেছিল সেই টিমই নামল। এবং ইংল্যাণ্ড তার তৃতীয় খেলাটিও ২-২ গোলে অমীমাংসিত রেখেছে। এর মধ্যে ব্রাজিল ২-০ গোলে রাশিয়াকে হারায়। গ্যারিঞ্চা সেই প্রথম খেলতে নেমেছিল।

প্লে—অফের পরীক্ষায় বৃটেনের তিনটি টিম

ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া দুটি টিমই সমভাবে তিন পয়েণ্ট পেয়ে খেলা শেষ করায় কোয়ার্টার ফাইনালে সুইডেনের সঙ্গে খেলার অধিকার পাওয়ার জন্যে ঠিক হল তাদেরকে প্লে-অফ খেলতে হবে। এর মানে প্লে-অফের ভাগ্য নির্ধারণে তিনটি ব্রিটিশ টিম জড়িয়ে পড়ল। মোট চারটি ব্রিটিশ টিমের ভিতরে স্কটল্যাণ্ডই একমাত্র টিম যারা হেরেছিল প্রথম রাউণ্ডেই। ইংল্যাণ্ড, উঃ আয়ার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে

এবং ফ্রান্স, ওয়েলস ও হাঙ্গেরির বিরূদ্ধে প্লে-অফ খেলার যোগ্যতা পেয়েছে।

ওদের গ্রুপে হাঙ্গেরি ছাড়াও ছিল মেক্সিকো ও সুইডেন। ১৯৫৬ এর বিদ্রোহের জন্য হাঙ্গেরি তার পূর্বতন ফুটবল তারকার মধ্যে এতগুলিকে হারিয়েছিল যে তখন তাদেরকে ১৯৫৪র দলের ছায়া মাত্র বলা যেতে পারে। টুর্নামেণ্টের প্রথম খেলায় সুইডেন যখন মেক্সিকোর কাছে ১-০ গোলে হারছিল সেসময় ওয়েলস তাদের হাঙ্গেরির সঙ্গে খেলাটি ১-১ গোলে ড্র রাখে। ফিরতি খেলায় সুইডেন হাঙ্গেরিকে হারায় ২-১ গোলে। কিন্তু মেক্সিকো খেলার শেষের দু মিনিট আগে গোল শোধ করায় ওয়েলস ১-১ গোলে অমীমাংসিত রাখতে বাধ্য হয়।

যা ওয়েলসের কাছ থেকে আশা করা হয়েছিল তা হাঙ্গেরির পক্ষে সম্ভব হল। অতঃপর তারা মেক্সিকোকে হারিয়ে দেয়। কিন্তু ওয়েলস সুইডেনের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র ফলাফল রেখে তাদের প্রত্যাশা জীইয়ে রাখে। ষ্টকহোমে প্লে-অফ খেলায় আধ ঘণ্টা খেলার পরও ওয়েলস এক গোলে পিছিয়ে ছিল কিন্তু তাদের পক্ষে অলচার্চ কার ও টেরি মেডউইন দ্বিতীয়ার্ধে দুটি গোল করে কোয়ার্টার ফাইনালে স্থান পাওয়ার ব্যবস্থা পাকা করে।

ইংল্যাণ্ড অতদূর পৌঁছতে পারল না। ১৯৫৮র ১৭ জুন তারিখে গথেনবার্গে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাদের টিমে কিছু পরিবর্তন হলেও ববি চার্লটন সেই টিমের বাইরেই রইল। পিটার ব্র্যাব্রুক তখন চেলসিতে খেলত। ডবেণ্টকে (তখনকার উলভসে'র প্লেয়ার) প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার জন্যে দলে ঢোকালে ব্রাব্রুক প্রায় হ্যাটট্রিক করে ফেলেছিল। দুবার সে পোষ্টে মেরেছে, আর একবার সে জালে বল ঢোকালেও অফসাইডের জন্য গোল নাকচ হয়ে যায়। সেদিন ছিল ইংল্যাণ্ডের দুর্ভাগ্য দিবস। এবং ইলিআইনের একমাত্র গোলে রাশিয়া জিতে যায়।

তখন চারটি ব্রিটিশ টিমের মধ্যে উত্তর আয়াল্যাণ্ড এবং ওয়েলসকে ঘিরে আশাটুকু বেঁচে রইল। উত্তর আয়াল্যাণ্ড হারল ফ্রান্সের কাছে, ওয়েলস ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ম্যাচ খোয়াল এক গোলের ফারাকে। তবুও ওয়েলস এক দারুণ খেলা খেলেছিল। প্রতিযোগিতায় সেই প্রথম ব্রাজিল তার বিস্ময় বালক 'পেলে'কে খেলিয়েছে। ওর খেলা দেখে সকলের দম আটকানোর অবস্থা। তার ফর্ম আশাতীত ভাবে প্রকাশ না পেলেও দর্শকরা পেলের সম্ভবনা অস্বীকার করতে পারেনি। খেলা শেষ হওয়ার আগে পেলে গোল করায় ব্রাজিল সেমি ফাইনালে উঠল। ওয়েলসের প্রত্যাশার হল শেষ।

অপর সেমিফাইনালে সুইডেন খেলেছে পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে। সেই প্রথম আমন্ত্রণকারী দেশ ষ্টকহোমের বাইরেই খেলতে গেছে। তাজ্জব ব্যাপার, গথেনবার্গে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে এক গোলে পিছিয়ে পড়েও তারা জিতেছে ৩-১ এর ব্যবধানে।

এর মধ্যে ষ্টকহোমের রামুণ্ডা ষ্টেডিয়ামে মোলাকাত হল ব্রাজিল ও ফ্রান্সের মধ্যে। সবাই চমকাল, ব্রাজিলের রক্ষণ ভাগ তাদের বিরুদ্ধে তখনো একটিও গোল হতে দেয়নি। ওদের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সেরা স্কোরার জ্যাতে ফন্ত্যাই ভাল খেলেছে। আবার অনেকে বলল ব্রাজিল চারটি খেলায় পাঁচ গোল করায় এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ঠিকমত আমল দেয়নি। তবে গ্যারিঞ্চা, ডিডি, ভাভা, পেলে জাগালো সমন্বিত ফরোয়ার্ড লাইনকে সবাই সেরা বলে মেনেছিল।

পূর্ণশক্তিতে ব্রাজিল

সর্বপ্রথম ব্রাজিলের আসল রূপ বেরিয়ে পড়েছে। ফ্রান্সের রক্ষণ ভাগে অন্যতম খেলোয়াড় জোঙ্কের প্রতি অবিচার করা হলেও ব্রাজিল অসাধারণ ভাল খেলেছে। সন্দেহ হয় সেদিন ব্রাজিলকে বিশ্বের কোন টিম সমস্ত শক্তি লাগিয়েও আটকাতে পারত কিনা! গ্যারিঞ্চা, ভাভাকে সুযোগ করে দিতেই প্রথম মিনিটেই ব্রাজিল এগিয়ে গেছে। কিন্তু আট মিনিট বাদে ফ্রান্স আশ্চর্যজনক ভাবে গোল করে দর্শকদের স্তম্ভিত করল। ফতঁ্যা গোলকীপারের চারদিকে ড্রিবল করতে করতে বল গোলের মধ্যে গড়িয়ে দেওয়ার আগে কোপা ও ফতঁ্যা পাঁচজন ডিফেণ্ডারের মধ্যে দিয়ে পাশ দেওয়া নেওয়া করেছে।

জোঙ্কের একবার আঘাত লাগতেই ফ্রান্সের আশাও নিবে গেল। তারা শেষে হেরেছে ৫-২ গোলে। পেলে শেষ তিনটি গোল করে ফুটবল জগতে রাতারাতি বিশেষ আলোড়নের পাত্র হয়ে উঠেছে। এর পরে সান্ত্বনা পুরস্কারের জন্য গথেনবার্গে জার্মানির সঙ্গে খেলতে নামল। এখানে ইতিপূর্বে নিজের কৃতিত্বে ৯টি গোল দেওয়া স্কোরার জ্যাতে ফতঁ্যা উপযোগী সময় হাতে পেল। ফতঁ্যা চারবার গোল করায় একদিকে তারা ম্যাচ জিতল ৬-৩ গোলে আর একদিকে তেরটি গোল করার কৃতিত্বে একটি সিরিজে সর্বোচ্চ গোল দাতা হিসাবে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল। চার বছর আগে পূববর্তী রেকর্ডটি ছিল হাঙ্গেরির কোজিসের। কোজিস করেছিল ১১টি গোল।

জাঁতে ফন্তঁ্যার বিদায়

দুঃখের কথা, ফন্তঁ্যার এটাই হল শেষ শীর্ষারোহন। দুর্ভাগ্য তাকে অনুসরণ করল। একজোড়া ভাঙা পা চিরকালের জন্য তাকে খেলা থেকে বাইরে রাখল। অতএব ফুটবল জগত হারাল তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ম্যাচ-উইনারকে। অবশেষে ২৯শে জুন, ১৯৫৮ তারিখে ফাইনাল খেলার আসর হল প্রস্তুত। সবকিছু তখন সুইডেনের স্বপক্ষে। সুরুতেই বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় এবং ম্যাচের মাঝেও বৃষ্টি চলায় মাঠ ক্রমশই হয়ে উঠল নরম ও পিচ্ছিল। সুইডেনের কোচ জর্জ রেনর তার খেলোয়াড়দের উপদেশ দিল যে ব্রাজিলের প্রতিটি প্লেয়ারের উপর কড়া নজর রাখতে হবে। খেলোয়াড় মনস্থ করল তাদেরকে চটপট গোল করতে হবে।

অনুপম ভাবে ব্রাজিলিয়ানদের ঠাণ্ডা মাথায় আগাগোড়া খেলতে দেখেও অনেক অভিজ্ঞ ফুটবল পণ্ডিত মত দিলেন সুইডেন যদি ফাইনালে একবার গোল করে তবে ব্রাজিল তাদের খেলার ঢঙ হারিয়ে ফেলবে। এই মতামতের উপরেই ফাইনালে সুইডেনের ফুটবল ফন্দি গড়ে উঠেছে। খেলার সুরুতেই সুইডেন গোল করেছে। মাত্র পাঁচ মিনিট পরেই লিডহোম নিজের জায়গামত বল পেয়ে শট করে তার টিমকে এগিয়ে দেয়। তখন সুইডেন জয়লাভের পথে।

ব্রাজিল টিমের কোন খেলোয়াড়কে সুইডেনের প্লেয়াররা আগলাবে সেটাই হল সমস্যা। রাইট উইংয়ে হ্যারিকেন ঝড়ের গতিতে গ্যারিঞ্চা ছুটেছে অথচ ডিডি, মিডফিল্ডের কাছাকাছি দ্রুত চলা ফেরা করছিল এবং অতি প্রয়োজনে নিজেকে ফাঁকা করার কাজে পাহারা দিচ্ছিল জিটো। মাঝখানে ভাভা ছিল দ্রুত ও সচল। জাগালো আউট সাইড লেফট হিসাবে ভাল ভান করতে পারলেও বিপরীত ভাবে সে ছিল একজন হানাদার ও মাঝ মাঠের তুরন্ত খেলোয়াড়।

এরপরই পেলে অবিশ্বাস্য। বিশ্বের খেলার লেখকদের ডিকশনারিতে যে কোন ক্রিয়া বিশেষণের যোগ্য। যারা তাকে এই নতুন দেখল তারা দেখছিল যে একটি চমৎকার ফুটবলারের জীবনের সুরু হচ্ছে। তখন খুব কম লোকই আঁচ করতে পেরেছিল যে পরে এই প্রতিভাটিকে নিকৃষ্ট প্লেয়াররা লাথি ও হিংস্রতা দিয়ে আক্রমণ করবে।

যাহোক ১৯৫৮র ফাইনালে তা হয়নি। বত্রিশ মিনিটের মাথায় গ্যারিঞ্চা বিদ্যুৎ গতিতে ঢুকে গোল করতেই সুরু হল যথার্থ ঝকমকে ফুটবল খেলা। ভাভা গোল করল তার নিচু সেণ্টারে। পঞ্চান্ন মিনিট কোনঠাসা অবস্থার মধ্যেও ধীর স্থির অবিস্মরণীয় বুদ্ধি ও পটুতা দেখিয়ে বুক থেকে বলটি নামিয়ে জালে মেরে তৃতীয় গোলটি করেছে পেলে। ডিডি, জাগালোকে কয়েকবার গোল করার সুযোগ করে দিলেও সুইডেনের পক্ষে সিমন্সোন তার দলের একটি মাত্র গোল করে। ঠিক সেই সময়ে পেলে হেড করে পঞ্চম গোল করেছে। কিক-অফের সময় না থাকায় সবাই ফাঁপরে পড়ল ব্রাজিল ৪-২ না ৫-২ কোন ফলাফলে জিতেছে? সুইডেন মাঠ ছাড়ার সময় সকলেই সদ্য সমাপ্ত ওয়ার্ল্ড কাপের কয়েকটি কথা নিয়ে গুণ গুণ করেছে: ব্রাজিল সর্বকালের শ্রেষ্ঠ টিম। জ্যাতে ফন্ত্যাঁ চমৎকার ম্যাচ উইনার। দীপ্তিমান ফুটবল তারকা পেলে এবং সবচেয়ে উদ্বুদ্ধ টিম উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড। উপসংহারে সকলেই স্বীকার করেছে, পেলে এতটা মূর্ত হয়েছে সে ফন্ত্যাঁকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাই ১৯৫৮র ওয়ার্ল্ড কাপ পেলের নামেই তোলা থাক।

কম কথায় বলা চলে এই ফুটবল চ্যামপিয়নশিপের একমাত্র গুরুত্ব ছিল, ফুটবল স্কিলের উৎকর্ষতা, বিরোধী শক্তিমত্তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। মগজী ফুটবল বলতে যা বোঝায় এই অনুষ্ঠানে তাই সফল হয়েছে। বেশির ভাগ খেলোয়াড়কেই দেখা গেছে তারা বল ধরবার আগে নিজেকে ফাঁকা রেখেছে। খেলার উপর ঝড়ের গতিতে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং দেখিয়েছে অবিশ্বাস্য সমঝওতার উদাহরণ। ইতালিয়ানরা প্রমাণ করেছে তারা খাঁটি ফুটবলার। বলের সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ ঘটলেই তারা সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ও নষ্ট করেনি। যে কোন উচ্চতা থেকে তারা বল ধরেছে এবং উঁচু বা নীচু দুরকম বলেই হেড করতে দ্বিধা করেনি। একত্রে টিমের মধ্যে মিশে গিয়ে তারা যে কোন মূহূর্তে কার্যকরি ভূমিকা নিয়েছে। ইতালিয়ানরা তাদের টিমকে ৪-২-৪ ছকে সাজালেও যখন খুশি তাদের আটজন ফুটবলারকে বিপক্ষের ফাঁদে ঢুকতে দেখা গেছে তেমনি দ্রুত নেমে এসে তারাই বিপক্ষের প্রতি আক্রমণ প্রতিহত করেছে।

টিম হিসাবে সুইডেন ফ্রান্সের চেয়ে সামান্য মাত্র উৎকৃষ্ট ছিল। তবু তাদের টিমেও ভাল খেলোয়াড়ের সমাগম ঘটেছিল বলেই ইতালি দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। তবে ফ্রান্স টিম প্রমাণ করেছে তারা অদম্য। জার্মানি চতুর্থ স্থান পাওয়ায় প্রমাণিত হয়েছে এর আগের বিশ্বকাপে তাদের প্রথম স্থান অধিকার করা কিছু অসঙ্গত হয়নি।

খেলার ফলাফল

১৯৫৮

সুইডেন

পুল—১

পঃ জার্মানি ঃ ৩ রান (২) স্মিড
আর্জেন্টিনা ঃ ১ কোর্বাট্টা

উঃ আয়ার্ল্যাণ্ড ঃ ১ কাশ
চেকশ্লোভাকিয়া—০

পঃ জার্মানি ঃ ২ শেফার, রান
চেকশ্লোভাকিয়া ২ ভোর্‌য়্যাক (পেনাল্টি) জিকান

আর্জেন্টিনা ঃ ৩ কোর্বাট্টা, মেনেনদেজ, অ্যাভিও
উঃ আয়ার্ল্যাণ্ড ঃ ১ ম্যাকপার্ল্যাণ্ড

উঃ আয়ার্ল্যাণ্ড ঃ ২ ম্যাকপার্ল্যাণ্ড (২)
পঃ জার্মানি ঃ ২ রান, সীলার

চেকশ্লোভাকিয়া ঃ ৬ জিকান (২) হোভর্কা (২) ভোর্‌য়্যাক ফিউরিজল
আর্জেন্টিনা ঃ ১ কোর্বাট্টা (পেনাল্টি)

প্লে-অফ

উঃ আয়ার্ল্যাণ্ড ঃ ২ ম্যাকপার্ল্যাণ্ড (২)
চেকোশ্লোভাকিয়া ঃ ১ জিকান
(অতিরিক্ত সময়ে)

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
পঃ জার্মানি	৩	১	২	০	৭	৫	৪
উঃ আয়ার্ল্যাণ্ড	৩	১	১	১	৪	৫	৩
চেকশ্লোভাকিয়া	৩	১	১	১	৮	৪	৩
আর্জেন্টিনা	৩	১	০	২	৫	১০	২

প্লে-অফ খেলার পরে উঃ আয়ার্ল্যান্ড দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছেছে

পুল—২

ফ্রান্স ঃ ৭ ফর্ত্যা (৩) পিয়ানটনি, উইজনিস্কি, কোপা, ভিনসেণ্ট।
প্যারাগুয়ে ঃ ৩ অ্যামাবিলা ২ (একটি পেনাল্টিতে) রোমেরো

স্কটল্যাণ্ড ঃ ১ মারে
যুগোশ্লাভিয়া ঃ ১ পেটাকোভিক

যুগোশ্লাভিয়া ঃ ৩ ভেসেলিনোভিক (২) মিলুটিনোভিক
ফ্রান্স ঃ ২ ফর্ত্যা (২)

প্যারাগুয়ে ঃ ৩ অগেরো, রে, প্যারোডি
স্কটল্যাণ্ড ঃ ২ মুডি, কলিন্স

যুগোশ্লাভিয়া ঃ ৩ অগজানোভিক, ভেসেলিনোভিক, রাজকোভ
প্যারাগুয়ে ঃ ৩ প্যারোডি, অগেরো, রোমেরো

ফ্রান্স ঃ ২ কোপা, ফর্ত্যা
স্কটল্যাণ্ড ঃ ১ বেয়ার্ড

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
ফ্রান্স	৩	২	০	১	১১	৭	৪
যুগোশ্লাভিয়া	৩	১	২	০	৭	৬	৪
প্যারাগুয়ে	৩	১	১	১	৯	১২	৩
স্কটল্যাণ্ড	৩	০	১	২	৪	৬	১

পুল—৩

সুইডেন ঃ ৩ সাইমনসন (২) লিডহোম (পেনাল্টি)
মেক্সিকো ঃ ০

ওয়েলস ঃ ১ জন চার্লস
হাঙ্গেরি ঃ ১ বোজিক

ওয়েলস ঃ ১ আইভর অলচার্চ
মেক্সিকো ঃ ১ বেলমোন্তে

সুইডেন ২ হ্যামরিন (২)
হাঙ্গেরি ১ টিচি

ওয়েলস ০
সুইডেন ০

হাঙ্গেরি ৪ টিচি (২) স্যাণ্ডর, বেঙ্কসিস
মেক্সিকো ০

প্লে-অফ

ওয়েলস ২ অলচার্চ, মেডউইন
হাঙ্গেরি ১ টিচি

কে ? কোথায় ?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
সুইডেন	৩	২	১	০	৫	১	৫
ওয়েলস	৩	০	৩	০	২	২	৩
হাঙ্গেরি	৩	১	১	১	৬	৩	৩
মেক্সিকো	৩	০	১	২	১	৮	১

প্লে-অফ খেলার পরে ওয়েলস দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছেছে

পুল ৪

ইংল্যাণ্ড ২ কেভান, ফিনি (পেনাল্টি)
রাশিয়া ২ সাইমোনিয়ান, ইভানভ

ব্রাজিল ৩ মাজোলা (২) নিল্টন স্যাণ্টোস
অষ্ট্রিয়া ০

ব্রাজিল ০
ইংল্যাণ্ড ০

রাশিয়া ২ ইলিয়াইন, ইভান
অষ্ট্রিয়া ০

ব্রাজিল ২ ভাভা (২)
রাশিয়া ০

ইংল্যাণ্ড ২ হেনেস, কেভান
অষ্ট্রিয়া ২ কোলার, কোর্নার

প্লে—অফ

রাশিয়া ১ ইলিয়াইন
ইংল্যাণ্ড ০

কে ? কোথায় ?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
ব্রাজিল	৩	২	১	০	৫	০	৫
রাশিয়া	৩	১	১	১	৪	৪	৩
ইংল্যাণ্ড	৩	০	৩	০	৪	৪	৩
অষ্ট্রিয়া	৩	০	১	২	২	৭	১

প্লে—অফ খেলা শেষে রাশিয়া দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছেছে।

কোয়ার্টার ফাইনাল

ব্রাজিল ১ পেলে
ওয়েলস ০

ফ্রান্স ৪ ফন্তাঁ (২) উইজনিস্কি, পিয়ানটনি
উঃ আয়ার্ল্যাণ্ড ০

সুইডেন ২ হ্যামরিন, সাইমনসন
রাশিয়া ০

পঃ জার্মানি ১ রান
যুগোশ্লাভিয়া ০

সেমিফাইনাল

ব্রাজিল ৫ পেলে (৩) ভাভা, ডিডি
ফ্রান্স ২ ফত্ত্যাঁ, পিয়ানটনি

সুইডেন ৩ স্কোগ্লাণ্ড, গ্রেন, হ্যামরিন
পঃ জার্মানি ১ শেফার

তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণায়ক খেলা

ফ্রান্স ৬ ফত্ত্যাঁ (৪) কোপা (পেনাল্টি) ডুইস
পঃ জার্মানি ৩ সিজলার্কজিক, রান, শেফার,

ফাইনাল

ব্রাজিল ৫ ভাভা (২) পেলে (২) জাগালো
সুইডেন ২ লিডহোম, সাইমনসন

সবশেষে কে ? কোথায় ?

প্রথম—ব্রাজিল, দ্বিতীয়—সুইডেন, তৃতীয়—ফ্রান্স, চতুর্থ—পঃ জার্মানি

ব্রা-জিল, চা—চা—চা

বিশ্বকাপের খেলা আরম্ভ হয়েই একধাপ ভুল পথে এগিয়ে যায়। ইতিপূর্বে এমন চড়া মেজাজের প্রতিযোগিতা আর হয়নি। এই প্রথম দেখা গেল নামজাদা খেলোয়াড়দের টিপ করেই যত মারামারির সূত্রপাত হচ্ছে।

বিশ্ব ফুটবল মান এত নিচুতে নামার কারণ ঃ টিমগুলো বল নিয়ে খেলার চেয়ে বেশি আগ্রহী হল বিপক্ষকে যে করে হোক রুখে দেবই—এই পন্থায়। ট্যাকলিং এত মারাত্মক হয়ে উঠল যে দিনের পর দিন আহতের ফর্দ বেড়েই চলেছে। প্রথম তিন দিনের খেলায় যে ত্রিশ জন খেলোয়াড় চোট পায় তাদের মধ্যে পেলেও বাদ পড়েনি। চেকশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে ব্রাজিলের খেলায় পেলের পেশী সাঙ্ঘাতিক জখম হয়। এজন্যেই ওকে বাকি খেলাগুলো থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

চড়া মেজাজের ফুটবল

ওই আঘাতটা ছিল সম্পূর্ণ দুর্ঘটনাজনিত। অন্যগুলো কিন্তু তা ছিল না। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে রাশিয়া—যুগোশ্লাভিয়ার খেলায় রাশিয়ার ব্যাক ডুবিনস্কি'র পা ভাঙে। মাঠ থেকেই তাকে সোজা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার আগেও যুগোশ্লাভরা সমস্যায় পড়েছিল। কারণ প্রথমার্ধে ভাল খেললেও রাশিয়া এগিয়ে যেতেই ওদের মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। দুটো

টিমই অসংযত ও বিপজ্জনক ট্যাকল করতে আরম্ভ করে। রেফারি যুগোশ্লাভদের পেনাল্টি দিতে অরাজি হলে অবস্থা এত হাতছাড়া হয় তারা তেরিয়া হয়ে রেফারিকে প্রায় মারতে যায় আর কি!

যুগোশ্লাভ কর্মকর্তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে যে সব খেলোয়াড় রেফারি ডার্কোভিককে মেরেছিল তাদের শাস্তিসরূপ বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। ২রা জুন (প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিনে) সত্যি বিস্ফোরণ ঘটল। অ্যারিকাতে যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে উরুগুয়ের খেলায় ঘটল প্রথম বিপর্যয়। উরুগুয়ে খুব ভালভাবে সূচনা করে প্রথম গোল করে। কিন্তু ওইবার চিলিতে আবিষ্কৃত নেতিবাচক ট্যাকটিক্সের ফ্যশান ধরে আটজন প্রতিপক্ষ রক্ষণভাগের সামনে পড়ে প্রথমার্ধের আগেই উরুগুয়ে ৩-১ গোলে পিছিয়ে যায়। শেষে উরুগুয়ে এত নিরাশ হয়ে পড়ে যে তাদের মেজাজও তিরিক্ষে হয়ে ওঠে। খেলা ভাঙার কুড়ি মিনিট আগে যুগোশ্লাভিয়ার পপেভিক ও উরুগুয়ের ক্যাবরেবাক—দুজনকেই মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়।

ইতালির খবরের কাগজে চিলির প্রতি বিষোদ্গার

স্যান্টিয়াগোতে তখন চলছিল ইতালি ও চিলির খেলা। সেখানে যে রকম প্রচণ্ড মারামারি হয়েছে তাতে অ্যারিকার ঘটনাকেও নেহাত বাচ্চা ছেলের খুনসুটেমি বলা চলে। খেলার আগে থেকেই রেষারেষিতে মদত দেওয়া হচ্ছিল। ইতালির এক পত্রিকায় সমস্ত কিছুর জন্যে চিলিকে দোষের ভাগী করে এক প্রবন্ধ লেখা হয়। আসলে এটা আদৌ ফুটবল রচনা ছিল না। ওই রচনাটি লেখা হয় চিলির লোকদের সম্পর্কে সত্যি কথা বলার উদ্দেশ্যেই।

ওই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে সংবাদ দাতারা সারমর্মটি চিলিতে বার করার জন্যে পাঠাতেই চিলির লোকেরা ক্ষেপে উঠল।

ওই দোষারোপের ফলে তারা এত রেগে ওঠে যে লেখকের সম্বন্ধে তারা বিন্দুমাত্র চিন্তা করেনি। এজন্য ওদেরকে দোষ দেওয়া যায় না। স্যান্টিয়াগোতে ওই হতভাগ্য দোশরা জুন, তারিখে ইতালি টিম মাঠে ঢুকতেই উপস্থিত ৬৬০৫৭ দর্শক টিটকারি দিতে থাকে। এর জের টেনে যা চলেছে তার সঙ্গে আদৌ ফুটবলের কোন সম্পর্ক ছিল না।

ম্যাচটি নিয়ে হাজার হাজার শব্দ সাজিয়ে যা লেখা হয়েছে তাতে কতটা সত্যি—মিথ্যে ছিল তা যাচাই করা খুবই দুষ্কর।

খেলার গোড়াতেই ইতালির ফেরেনি ও চিলির ছটফটে প্লেয়ার লিডনেল সাঁশেতের মধ্যে লাথালাথি হতেই ঘটনাটি পুরাতন রূপ নিয়েছে। আবার ফেরেনিকে লাথি মারলে সে প্রতিশোধ নিল। ইলফোরডের ইংরাজ রেফারি কেন অ্যাস্টন যিনি পরে ফিফা'র রেফারিদের কমিটিতে স্থান পেয়েছেন তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে বার করে দেন।

অবাধ্য ফেরেনি

ফেরেনি যেতে চাইল না। আট মিনিট বাদে পুলিশ ইতালির টিমকে ড্রেসিংরুমে নিয়ে গেলে মাঠে শান্তি ফিরে এল। খেলা খতম করার জন্যে অ্যাস্টনও প্রায় স্থির করে ফেলেছিলেন তা না হলে ফিফা'র পক্ষে দারুণ সমস্যা হয়ে উঠত।

এই ঘটনার পরেই ফুটবল খেলা শিকেয় উঠল। দুটো দলই আত্মরক্ষায় মন দিয়েছে। যখন খেলোয়াড়দের সামলানো হচ্ছিল তখনি প্লেয়াররা তাদের বাধাদানকারীদের কঠোর শাস্তি দেবার জন্যে রেফারিকে যুক্তি দেবে কিনা ভেবে রাগে ফুঁসেছে। এরপরেই একটা মারামারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিওনেল সাঁশেৎ নিল মূল ভূমিকা। ডেভিড ওকে উসকে দিতেই ও ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেভিডে'র গায়ের উপর। ক্রমাগত তাকে ঘুঁষি মেরে চলছে। অবাক ব্যাপার,

সাঁশেংকে কিন্তু মাঠ থেকে বার করা হল না। যদিও কিছুক্ষণ পরে ডেভিড চিলির খেলোয়াড়দের লাথি মারতেই তাকে আর মাঠে রাখা হয়নি।

তখন ন'জনে খেলতে বাধ্য হওয়ায় ইতালির প্লেয়াররা ভাবল জয়লাভ অসম্ভব। অগত্যা তারা সম্ভাব্য বেয়াদবি করে সময় কাটানোর জন্যে প্রত্যেককেই পিছনে টেনে আনল। চিলির খেলোয়াড়দের সাধারণ দক্ষতায় এই আত্মরক্ষার বেড়া ভেদ করা সম্ভব ছিল না। নিরুপায় হয়ে শেষের দিকে চাপান দু গোলেই তারা নিজের অনুকূলে খেলার সমাধান করে নিয়েছে।

গুরু পাপ লঘু দণ্ড

এই ন্যক্কারজনক ঘটনার পর ফিফার সদস্যরা অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছে। তারা একত্রে খেলার ফিল্ম লক্ষ্য করে রায় দিল, ফেরেনিকে একটি মাত্র খেলা থেকে বরখাস্ত করা হবে। সঙ্গেসঙ্গে ডেভিড ও লিওনেল সাঁশেংকে কঠোর ভাবে সতর্ক করা হল। সাঁশেংকে এও নির্দেশ দেওয়া হল রেফারির রিপোর্টে তার বিষয়ে উল্লেখ ছিল না তাই, তা না হলে তার উপরেও শাস্তি বিধান আরও কঠোর হত। সব মিলিয়ে ১৯৬২-র ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা অশান্তিতে কাটলেও কতকগুলো স্মরণীয় ঘটনাও ঘটেছে। যেমন কলম্বিয়া ও রাশিয়া সাড়াজাগানো ৪-৪ গালের ড্র খেলা। মাত্র তের মিনিটের মধ্যে রাশিয়া ৩-০ গোলে এগিয়ে যায়, এবং তারা এক ঘণ্টার কিছু আগে জিতছিল ৪-১ গোলে। কিন্তু কলম্বিয়া রে রে করতে করতে এসে সমান করে ফেলে।

প্রথম রাউণ্ড পুলের শেষ দিনে রীতিমত তামাশা থাকায় কলম্বিয়ার পক্ষে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের পুনরাবৃত্তি করা হল না। তারা যুগোশ্লাভিয়ার কাছেও খেয়েছে ৫-০ গোলের গোবড়েন। কিন্তু মেক্সিকোর কাছে

১৯৬২ র ৭ জুন, তারিখটি ছিল চিরকাল স্মরণে রাখার মত। সর্বপ্রথম সেবারই তারা ওয়ার্ল্ড কাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে একটি খেলায় জিতেছে। ওই জয়লাভ ওদের গোলরক্ষক অ্যান্টিনিও কার্বজলের (যে সেবার নিয়ে চতুর্থবার বিশ্ব কাপ খেলেছিল) কাছে বিস্ময়কর ভাবে হয়ে দাঁড়াল তেত্রিশতম জন্ম দিনের উপহার সরূপ। চেকশ্লোভাকিয়া পনের সেকেণ্ডের মাথায় গোল করে দিনটি সুরু করেছে। তবু এর সিকি ঘণ্টা পরেই মেক্সিকো শোধ করে দেয়। এটাই ছিল চেকশ্লোভাকিয়ার বিরূদ্ধে প্রতিযোগিতার প্রথম গোল।

চেকোশ্লোভাকিয়ার দুর্বার গতি

জয়লাভ সম্বন্ধে চেকশ্লোভাকিয়া ছিল নিশ্চিত। গ্রুপে তুঙ্গে থাকার জন্যে গোল বাড়ানোর চেষ্টায় তারা আক্রমণের সব রকম চেষ্টা ঢেলে দিয়েছে। এতে তাদের রক্ষণ ভাগ এলোমেলো হয়ে পড়ে। মেক্সিকো প্রথমার্ধের আগেই এগিয়ে রইল। শেষ হওয়ার দুমিনিট আগে পেনাল্টি কিক পেয়ে তারা ম্যাচটি মীমাংসা করেছে নিজেদের অনুকূলে। এই খেলাটিতে তারা অদ্ভুতভাবে ৩-১ গোলে জেতে।

এইসব যখন চলছিল তখন রাঙ্কাগুয়তে ইংল্যাণ্ড গ্রুপ ম্যাচে আর্জেন্টিনা, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরির সঙ্গে খেলে চলছে। এটা এমনি একটি গ্রুপের খেলা যা কারো কারো কাছে হিংস্রতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ লাগলেও এই খেলা নিয়ে শিরোনামে তৈরী করা যায়নি। তবুও আর্জেন্টিনা ও বুলগেরিয়ার প্রথম খেলাতেই নব্বই মিনিটে ফাউল হয়েছিল উনসত্তরটি। আর্জেন্টিনা এই মন্থর, প্রাণহীন ম্যাচটিতে জেতে মাত্র একটি গোলে।

দুভার্গ্যজনকভাবে ফরোয়ার্ডদের কাজকারবারের জন্যে ইংল্যাণ্ড মাশুল গুণেছে। ইংল্যাণ্ড হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে ২-১ গোলে হেরেই জোর লয়ে খেলা সুরু করে। ইংল্যাণ্ডের একমাত্র গোলটি হয় পেনাল্টি

থেকে। আর্জেন্টিনার সঙ্গে ম্যাচে পিকক, গ্যারি হিচেন্সের পরিবর্তে আক্রমণের নেতৃত্ব দিলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। খেলা সুরুর প্রায় সিকি ঘণ্টার পরেই পিকক গোল করেছে। আর্জেন্টিনার একজন ডিফেণ্ডার বলে হাত দিলে ফ্লাওয়ার্স ইংল্যাণ্ডের পক্ষে আর একটি গোল পেনাল্টি করে। একবারে হাফটাইমের কাছাকাছি চার্লটন একটি গোল করে দেখিয়ে দেয় কেমন করে দর্শনীয় গোল করা উচিত। দ্বিতীয়ার্ধে গ্রিভস তৃতীয় গোলটি করে ইংল্যাণ্ডকে আশ্বস্ত করলেও শেষ হওয়ার মুখে তারা প্রায় একটি গোল খেয়ে বসেছিল।

ধাতছাড়া ইংল্যাণ্ড টিম

গ্রুপে প্রথম হওয়ার জন্যে হাঙ্গেরি চমৎকার খেলা দেখিয়ে বুলগেরিয়াকে ৬-১ গোলে ধ্বংস করে ও আর্জেন্টিনার সঙ্গে ০-০ ড্র করে পাঁচ পয়েন্ট পায়। আর্জেন্টিনা পেয়েছিল তিন পয়েন্ট। ইংল্যাণ্ড (দুই পয়েন্ট) ও বুলগেরিয়ার (শূন্য) মধ্যে তখনও একটি মাত্র ম্যাচ বাকি ছিল। ইংল্যাণ্ডের প্রয়োজন ছিল একটি ড্র করার। তারা তা পেরেওছে। ম্যাচটি যারা দেখেছে তাদের অভিমত এর আগে ইংল্যাণ্ড কোনদিন এত খারাপ খেলেনি, বা এরকম ক্লান্তিকর ম্যাচে ইংলণ্ড কখনো অংশ নেয়নি। ইংল্যাণ্ডের রক্ষনভাগ ভাল খেললেও ফরোয়ার্ডরা ছিল কিছুটা ধাত ছাড়া গোছের। ম্যাচ শেষ হওয়ার মুখে বুলগেরিয়া একটি কর্ণার কিক পায় কিন্তু,কিক করতে দূর থেকে আসার জন্যে অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে।

ইংল্যাণ্ড কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠায় প্রতিযোগিতা পৌছায় নক-আউট স্টেজে। রাশিয়ার খেলা পড়ল চিলির সঙ্গে এবং যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে পশ্চিম জার্মানি। ভিনা ডেল মারেতে হাঙ্গেরি খেলছিল চেকশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে। ইংল্যণ্ডের খেলা ছিল পূর্ববর্তী বিজেতা ব্রাজিলের বিরুদ্ধে।

সান্টিয়াগোতে যুগোশ্লাভিয়া খেলা ভাঙার পাঁচ মিনিট আগে একটি গোল করে পশ্চিম জার্মানিকে হারায়। রাঙ্কাগুয়াতে ১—০ গোলে চেকশ্লোভাকিয়া হারায় হাঙ্গেরিকে।

চি—চি—চি—লি—লি—লি

অ্যারিকাতে চিলি রাশিয়াকে ২—১ গোলে হারালে সারা চিলিতে এত স্ফূর্তির ঢেউ ওঠে যানাকি চিলিতে আগে কোনদিন দেখা যায় নি। স্যান্টিয়াগোর রাস্তা ভরে যায় পতাকা হাতে ও নাচে মশগুল লোকের ভিড়ে। জনাকীর্ণ রাস্তার মধ্যে দিয়ে পতাকা হাতে জনতা লরি চেপে এগিয়ে চলে। সব জায়গায় একই চিৎকার "চিলি—চি—চি—চি—লি—লি—লি—চি—লি।"

সেদিনই ইংল্যাণ্ড ব্রাজিলের কাছে ৩—১ গোলে পরাজিত হওয়ায় ইংল্যাণ্ড দল এই আনন্দোৎসবে যোগ দিতে পারেনি। ভিনা দেল মারতে ব্রাজিল সার্পোটারদের সঙ্গে ছিল সাম্বা ব্যাণ্ড এবং মুখে ছিল ব্রাজিল—চা—চা—চা শ্লোগান। ইংল্যাণ্ডে লক্ষ লক্ষ লোক (ইংল্যাণ্ড যেকোন ফুটবল মাঠেই) টেলিভিসনে তা শুনতে পেয়েছে। ওই চালু সংকীর্তনের সঙ্গে শোনা গেছে—সিটি দেওয়ার হররা —চা—চা—চা। ওই পরাজয় সম্পর্কে যতটা খারাপ ভাবা হয়েছিল ততটা খারাপ হয়নি। ইংল্যাণ্ড যতটা পেরেছে ভাল খেলেছে। আবার গোলের সামনে বল নিয়ে যেতেই তাদের দোষ ধরা পড়েছে। হাফটাইমে স্কোর সমান থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধের সুরুতেই দুটি গোল হওয়ায় ইংল্যাণ্ডের নিশ্চয়তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

স্যান্টিয়াগোর ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে সেমিফাইনাল খেলা ছিল চিলির সঙ্গে ব্রাজিলের। ওই দিনই ভিনা ডেল মারে'তে খেলা হচ্ছিল চেকশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে। ওখানে চেকশ্লোভাকিয়ার

৩—১ গোলে জয়লাভ দেখতে হাজির ছিল মাত্র ৫৮৯০টি দর্শক। চারটি গোলই চোখে লেগে আছে। মেক্সিকোর কাছে যে টিম ছুটো হেরেছিল শেষে তারাই উঠল ফাইনালে।

ইতিমধ্যে স্যান্টিয়াগোতে চিলির প্লেয়াররা গ্যারিঞ্চাকে কিছুটা ভুগিয়েছে। গ্যাবিঞ্চা স্যততাড়াতাড়ি গোল কবে ব্রাজিলকে এগিয়ে দিতেই ওদের ব্যাবহার আবও খারাপ হয়েছে। গ্যারিঞ্চা দ্বিতীয় গোল কবতেই সে যেন গুপ্ত হত্যাব শিকার হযে উঠল।

যেখানে এমনি উত্তেজনাপূর্ণ খেলা চলেছে সেখানে ব্রাজিলের হাবেব কথা ভাবাই যায না। শেষ পর্যন্ত ব্রাজিল জিতল ৪—২ গোলে। কিন্তু শেষ দশ মিনিটেব ছুজনকে মাঠ থেকে বাব কবে দিতেই খেলা পণ্ড হযেছে। পদাঘাত কবাব দোষে জড়িযে লাণ্ডা জিটো মাঠ ছাড়ে। ছুমিনিট বাদে প্রতিশোধে জড়াতে গ্যাবিঞ্চাকেও উত্তেজিত কবা হল। ফলে জীবনে সেই প্রথমবাব ওকে মাঠ থেকে বার কবে দেওয়া হয।

চেকশ্লোভাকিয়া সাফল্য থেকে ব্যর্থতায়

খেলা শেষেব ছু'মিনিট আগে গোল কবায় চিলি যুগোশ্লাভিয়াকে হাবিযে তৃতীয় হওযাব সান্ত্বনা পেযেছে। অতঃপব ১৯৬২-ব ১২জুন তাবিখেব ভাবনা দাড়াল—ব্রাজিল বিজয়ী আখ্যা বাঁচানোয় সক্ষম হবে কি না। তাবা পেবেছে, তবে ব্রাজিল প্লেয়াবরা ভয়ে কিছুক্ষণ সিঁটিয়ে গিয়েছিল। ফাইনালটি যে ধরণেব নাটকীয়তায় পৌঁছাল তা আগেব ক'দিনেব প্রতিযোগিতায় কখনো দেখা যায়নি।

চেকশ্লোভাকিয়া খেলেছে চতুব ও সংযমী ফুটবল। ওদেব ছুখোর মিডফিল্ড ম্যান ভ্যাসনাক ব্রাজিলেব ডিডির চেয়েও ভাল খেলেছে। আসলে পনের মিনিট পরে চেকশ্লোভাকিয়া এগিয়ে গেলেও

তার ছ মিনিট পরে স্রইফ (যে সারা প্রতিযোগিতায় চমৎকার দক্ষতার সঙ্গে চেকশ্লোভাকিয়ার গোল পাহারা দিয়েছে) অ্যামরিল্ডোকে বুঝতেই পারল না। তাড়াতাড়ি শটটি ধরার জন্যে ও বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু অ্যামারিল্ডোর প্রায়শঃ চোরা শটটি ওর নাগাল এড়িয়ে চলে গেল নেটে।

খেলা শেষের তেইশ মিনিট আগে জিটো গোল না করা পর্যন্ত ব্রাজিল অনিশ্চয়তায় ভুগেছে। দশ মিনিট বাদে স্রইফ রোদের জন্যে বলটি দেখতে না পেয়ে অযথা ধরার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করে। এই সুযোগে ভাভা ম্যাচটির ফলাফল নিশ্চিত করে তোলে।

সুতরাং দুইবারের বিজেতা ইতালি ও উরুগুয়ের নামের পাশে ব্রাজিলের নামও যুক্ত হল। ওদের সুখী সমর্থকরা সাম্বা নাচের সঙ্গে ব্রাজিল, ব্রাজিল চা—চা—চা বলে কীর্তন করতে করতে দেশে ফিরেছে।

খেলার ফলাফল

চিলি

গ্রুপ ১

উরুগুয়ে : ২ কিউবিল্লা, সাসিয়া
কলম্বিয়া : ১ জুলুয়াগা

রাশিয়া : ২ ইভানোভ, পোনেডেলনিক
যুগোশ্লাভিয়া : ০

যুগোশ্লাভিয়া : ৩ স্কোবলার (পেনাল্টি), গ্যালিক, জার্কোভিক
উরুগুয়ে : ১ ক্যাবরেরা

কলম্বিয়া : ৪ অ্যাসেরস, কোল, রাডা, ক্লিঞ্জার
রাশিয়া : ৪ ইভানোভ (২) চিসলেঙ্কো, পনেডেলনিক

রাশিয়া : ২ ম্যামিকিন, ইভানভ
উরুগুয়ে : ১ সাসিয়া

যুগোশ্লাভিয়া : ৫ জার্কোভিক (২) গ্যালিক, (২), মেলিক
কলম্বিয়া : ০

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
রাশিয়া ঃ	৩	২	১	০	৮	৫	৫
যুগোশ্লাভিয়া ঃ	৩	২	০	১	৮	৩	৪
উরুগুয়ে ঃ	৩	১	০	২	৪	৬	২
কলম্বিয়া ঃ	৩	০	১	২	৫	১১	১

গ্রুপ ২

চিলি ঃ ৩ এল স্য াশেৎ (২, ১ পেনাল্টি), র‍্যামিরেজ
সুইজারল্যাণ্ড ঃ ১ উয়াথরিশ

পঃ জার্মানি ঃ ০
ইতালি ঃ ০

চিলি ঃ ২ র‍্যামিরেজ, টোরো
ইতালি ঃ ০

পশ্চিম জার্মানি ঃ ২ ব্রালস, সীলার
সুইজারল্যাণ্ড ঃ ১ স্নেইটার

পঃ জার্মানি ঃ ২ সিমানিয়াস্ক (পেনাল্টি) সীলার
চিলি ঃ ০

ইতালি ঃ ৩ মোরা, বালগেরিলি (২)
সুইজারল্যাণ্ড ঃ ০

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
পঃ জার্ম্মানি	৩	২	১	০	৪	১	৫
চিলি	৩	২	০	১	৫	৩	৪
ইতালি	৩	১	১	১	৩	২	৩
সুইজারল্যাণ্ড	৩	০	০	৩	২	৮	০

গ্রুপ ৩

ব্রাজিল : ২ জাগালো, পেলে
মেক্সিকো : ০

চেকশ্লোভাকিয়া : ১ স্টিব্রেনি
স্পেন : ০

ব্রাজিল : ০
চেকশ্লোভাকিয়া : ০

স্পেন : ১ পেরো
মেক্সিকো : ০

ব্রাজিল : ২ আমারিল্ডো (২)
স্পেন : ১ অ্যাডেলার্ডো

মেক্সিকো : ৩ দিয়েজ, ডেলআগুইলা, এইচ হার্নাণ্ডেজ (পেনাল্টি)
চেকশ্লোভাকিয়া : মাসেক

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
ব্রাজিল	৩	২	১	০	৪	১	৫
চেকশ্লোভাকিয়া	৩	১	১	১	২	৩	৩
মেক্সিকো	৩	১	০	২	৩	৪	২
স্পেন	৩	১	০	২	২	৩	২

গ্রুপ ৪

আর্জেন্টিনা ঃ ১ ফ্যাকুণ্ডো
বুলগেরিয়া ঃ ০

হাঙ্গেরি ঃ ২ টিচি, অ্যালবার্ট
ইংল্যাণ্ড ঃ ১ ফ্লাওয়ার্স (পেনাল্টি)

ইংল্যাণ্ড ঃ ৩ ফ্লাওয়ার্স (পেনাল্টি) চার্লটন, গ্রিভস
আর্জেন্টিনা ঃ ১ স্যানফিলিপ্পো

হাঙ্গেরি ঃ ৬ অ্যালবার্ট (৩) টিচি (২) সলিমোসি
বুলগেরিয়া ঃ ১ সকোলভ

হাঙ্গেরি ঃ ০
আর্জেন্টিনা ঃ ০

ইংল্যাণ্ড ঃ ০
বুলগেরিয়া ঃ ০

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
হাঙ্গেরি	৩	২	১	০	৮	২	৫
ইংল্যাণ্ড	৩	১	১	১	৪	৩	৩
আর্জেন্টিনা	৩	১	১	১	২	৩	৩
বুলগেরিয়া	৩	০	১	২	১	৭	১

কোয়ার্টার ফাইনাল

চিলি ঃ ২ লিওনেল স্যাঁশেৎ, রোজ্যা
রাশিয়া ঃ ১ চিসলেস্কো

যুগোশ্লাভিয়া ঃ ১ র‍্যাডাকোভিক
পঃ জার্মানি ঃ ০

ব্রাজিল ঃ ৩ গ্যারিঞ্চা (২) ভাভা
ইংল্যাণ্ড ঃ ১ হিচেন্স

চেকশ্লোভাকিয়া ঃ ১ শেরার
হাঙ্গেরি ঃ ০

সেমিফাইনাল

চেকশ্লোভাকিয়া ঃ ৩ শেরার (২, ১ পেনাল্টি) ক্যাডরাবা
যুগোশ্লাভিয়া ঃ ১ জার্কোভিক

ব্রাজিলঃ গ্যারিঞ্চা (২) ভাভা (২) লিয়োনেল্স স্যাঁশেং (পেনাল্টি)
চিলি ঃ ২ টোরো

তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণায়ক খেলা

চিলি ঃ ১ রোজা
যুগোশ্লাভিয়া ঃ ০

ফাইনাল

ব্রাজিল ঃ ৩ অ্যামারিল্ডো, জিটো, ভাভা
চেকশ্লোভাকিয়া ঃ ১ মাসোপুষ্ট

সবশেষে কে ? কোথায় ?

প্রথম—ব্রাজিল, দ্বিতীয়—চেকশ্লোভাকিয়া, তৃতীয়—চিলি, চতুর্থ—যুগোশ্লাভিয়া।

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের আসর কোন সময়েই সুখের হয়নি, তেমনি ব্রিটেনের দিক থেকেও ওয়ার্ল্ড কাপ হয়েছে কম তৃপ্তিদায়ক। আগে পর্যন্ত, এই চলেছে। বাছাই পর্বের প্রতিযোগিতায় স্কটল্যাণ্ড, উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড ও ওয়েলস পর পর দুর্ভাগ্য বরণ করলেও ইংল্যাণ্ড এত দিনের মধ্যে সর্বপ্রথম ট্রফি পেয়েছে।

যুদ্ধ বিরতির রাত্রে যে ভাবে চাপা আনন্দ উপছে পড়ে এই জয়লাভও হয়েছে সেই ভাবেই সংবর্ধিত। লণ্ডনের রাস্তায় লোকেরা নেচেছে। আনন্দ ও বিজয়গর্বে আন্দোলিত হয়েছে ইউনিয়ন জ্যাক ও সেণ্ট জর্জের ক্রস। সর্বত্র আনন্দ ও উন্মত্ততার প্রাচুর্য। ওয়ার্ল্ড কাপ জয়ের ফলে ইংল্যাণ্ডে ফুটবল আগ্রহ বেড়ে উঠেছে। ফলে সেখানে লীগ ম্যাচের দর্শক সংখ্যাও অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ওয়ার্ল্ড কাপেও কতকগুলি অপ্রীতিকর ব্যাপার ছিল। সংগঠন ব্যবস্থা পূর্ববর্তী সমস্ত নজিরকে টপকেছে, এ সম্বন্ধে কারো সন্দেহ নেই। দর্শকদের হাজিরার হার সব নজিরকে ছাড়িয়ে গেছে। এতে অর্থ প্রাপ্তিও বেড়েছে—যা আজকের দিনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। টেলিভিসন প্রচারেও সেইমত বন্দোবস্ত। এই আগন্তুকের ভিড়ে বৃটেনের আবহাওয়া হয়েছে ভীষণ সরগরম। সেবারের মত ওয়ার্ল্ড কাপ স্যুভেনিরও এত সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কখনো সম্পাদিত হয়নি।

যাহোক, সেই অপ্রীতিকর ব্যাপারটা এখনো খোলাচার ও স্বচ্ছ।

সকলেরই ধারণা সমস্ত খেলাগুলো ওয়েম্বলিতে হওয়ার জন্যেই ইংল্যাণ্ড জিতেছে। এটা পুরপুরি বিদেশী প্রতিবাদই নয় এর মধ্যে ইংরাজরাও আছে। ইংল্যাণ্ড ও পর্তুগালের সেমিফাইনাল খেলাটি গুডিসন পার্কের বদলে ওয়েম্বলিতে খেলানো হলে নর্থ ওয়েষ্টের জন্য যারা টিকেট কিনেছিল তাদের মধ্যে হাজার হাজার ইংরেজের ব্যাপারটি মোটেই ভাল লাগেনি।

বিভ্রান্তিকর প্রচার যন্ত্র

দুর্ভাগ্যবশতঃ বিভিন্ন খবরের কাগজ, পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিসন কার্যসূচী লোকেদের ভুল পথে নিয়ে গেছে। বেশির ভাগ লোকই বড় বেশি আশা করেছিল। খেলা ড্র তৈরি হলে জানা যায়, একটি গ্রুপের বিজয়ী টিম অন্য গ্রুপের দ্বিতীয় টিমের সঙ্গে খেলবে। ওদের বিজয়ী টিমই কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার কথা। শুধু ঠিক ছিল না ওয়েম্বলি ও গুডিসন পার্কের মধ্যে কোথায় সেমিফাইনাল খেলা হবে? যে করেই হোক গুজব ছড়ায়, যদি ইংল্যাণ্ড সেমিফাইনালে ওঠে তবে খেলা হবে গুডিসন পার্কে।

লোকে গুজবে কান দিয়ে ফেলেছে। তখন প্রতিযোগিতার নিয়মকে কেউ গ্রাহ্যই করেনি। যাদের নর্থ ওয়েস্টের টিকেট ছিল তারা মনে করেছে নির্ঘাত ঠকল। সেই অনুসারে গুডিসন পার্কে পশ্চিম জার্মানি ও রাশিয়ার সেমিফাইনাল বেসরকারী ভাবে বর্জিত হওয়ায়, খেলা দেখেছে মাত্র ৩৮২৭৩ জন দর্শক। এভার্টন মাঠে সারা প্রতিযোগিতার মধ্যে এটাই ছিল দর্শকদের সর্বনিম্ন হাজিরা সংখ্যা।

ইংল্যাণ্ডের জয় যাতে নিশ্চিত হয় সেজন্যে তাদের প্রতিটি খেলা ওয়েম্বলিতে দেওয়া হচ্ছে বলে অন্যান্য দেশগুলি ফিফা'র

কাছে অভিযোগ পেশ করেছে। দঃ আমেরিকার কয়েকটি দেশও এক যোগে অভিযোগ রাখে, তাদের দেশে ট্রফি যাতে না যায় সেজন্যেই ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। আসল ব্যাপার আমন্ত্রণকারী দেশ সব সময়েই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে খেলে থাকে। এমতাবস্থায় ইংল্যাণ্ড প্রথম রাউণ্ডের গ্রুপে প্রথম হয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার জন্যে নিজের গ্রুপের মূল কেন্দ্রেই খেলার অধিকার পেয়েছে। ওয়েম্বলিতে সেমিফাইনাল খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ ছিল মূলতঃ অর্থকরি। এবং ওই সব প্রতিবাদকারীদের উত্তর দেওয়ার জন্যে প্রচুর দৃষ্টান্তও রয়েছে।

দৃষ্টান্তের রেলগাড়ি

স্যান্টিয়াগোর বাইরে চিলি মাত্র একটি খেলা খেলেছে। সেটা ছিল রাশিয়ার সঙ্গে কোয়ার্টার ফাইনাল। তারা প্রথম রাউণ্ডে দ্বিতীয় হয়েছিল। ১৯৫৮তে সুইডেন একবার মাত্র স্টকহোমের বাইরে অ্যারিকাতে খেলতে গিয়েছিল এবং ১৯৫০ সালে ব্রাজিল কেবল একটি ম্যাচই রায়ো ডি—জেনেরোর বাইরে খেলেছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯৫০র ওয়ার্ল্ড কাপে ইউরোপ ও দঃ আমেরিকার মধ্যে চলেছে প্রচণ্ড রেষারেষি। কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলায় আর্জেণ্টিনার র‍্যাটিনকে মাঠ থেকে বের করা হলে ওই ব্যাপারটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যাকে "জিহ্বার প্রতিহিংসা" নামে আখ্যা দেওয়া অন্যায় হবে না।

বাস্তবিকই আসলে কী ঘটেছিল সে সমন্ধে প্রচুর মতপার্থক্য রয়ে গেছে। ইংল্যাণ্ড প্লেয়াররা বলেছে সব সময়েই আর্জেণ্টিনার খেলোয়াড়রা তাদের গায়ে থুথু দিয়েছে, ফাউল করেছে এবং কথা কাটাকাটিতেও নিরস্ত হয়নি। আর্জেণ্টিনার প্লেয়ারদের দাবি, ইংল্যাণ্ড

খেলোয়াড়রা ভীষণ রাফ ও বদ মেজাজী খেলা খেললেও জার্মান রেফারি ওদেরকে তেমন সাজা দেয়নি। আর্জেন্টিনার ক্যাপটেন র‍্যাটিন রেফারির একটি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে সমূহ ব্যাপারটা চাড়িয়ে ওঠে। আবার তখন রেফারি ক্রিটলিন স্প্যানিশ ভাষাও জানত না। র‍্যাটিনও জানত না জার্মান ভাষা। বলা বাহুল্য ওদের দুজনের বাক্য বিনিময় হয়েছে অদ্ভুত ধরণের।

শেষ পর্যন্ত র‍্যাটিনকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়। ক্রিটলিন স্বীকার করেছেন র‍্যাটিন যে কি বলছিল তা তিনি বোঝেননি। তবে তার বিকৃত মুখভঙ্গি দেখে র‍্যাটিনকে বের করে দেওয়া ঠিকই হয়েছে।

র‍্যাটিনের জোরালো যুক্তি সে 'ক্যাপেটনের' অধিকারই সম্পন্ন করছিল এবং ওই ঘোর দুরবস্থায় একজন দোভাষী খুঁজেছে।

বাঁশি মুখে বিচারকরাও কি নির্দোষ ?

দুঃখের কথা সেইদিন হিলসবরোতে ছিল পঃ জার্মানি ও উরুগুয়ের কোয়াটার ফাইনাল। ইংল্যাণ্ডের জিম ফিনি ছিল এই খেলার রেফারি। উনি ট্রোশে ও সিলভাকে মাঠ থেকে বার করে দেন। উরুগুয়েও দাবি করেছে, বলটা জার্মান গোল লাইনের উপর পড়েছিল। তবু ফিনি খেলাটি বাতিল করে দেন। পরে উরুগুয়ের নিশ্চিত প্রাপ্য গোলটি পঃ জার্মানির স্নেলিঞ্জার হাত দিয়ে ধরলেও পেনাল্টি না দিয়েই তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

এই দৃঢ় মতামতের মধ্যে কতটা সত্যি আছে তা বলা অসম্ভব। কিন্তু এটা সত্যি দঃ আমেরিকার সমর্থকদের তরফ থেকেই তারা ইঙ্গিত দিয়েছে জার্মান রেফারি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলার সময় দঃ আমেরিকার প্লেয়ারকে বার করে দিয়েছে এবং সেই একই ভাবে ইংরাজ রেফারি জার্মানির বিরুদ্ধে খেলায় দুজন দঃ আমেরিকার

খেলোয়াড়কে বার করে দেওয়ায় সমস্ত ঘটনাটিতেই সঙ্গতির চেয়ে যেন বেশ কিছু গরমিল রয়ে গেছে।

দঃ আমেরিকার সমর্থকরা এও বলেছে ব্রাজিলের সম্ভাবনা চূর্ণ করবার জন্যেই ইউরোপীয়রা পেলেকে লাথিয়ে বার করে দেয়। এবং এতে সাহায্য করেছে ইউরোপীয়ান রেফারিরা। নিশ্চিত ভাবে এও বলা যায় ব্রাজিলের প্রথম ম্যাচেই পেলের প্রতি জঘন্য আচরণ করা হয়েছে। বুলগেরিয়া বিরুদ্ধে পঃ জার্মানির রেফারি কুর্ট সেশেনশনও ঝেশেভের ট্যাকলিংকে অতি মাত্রায় আস্কারা দিয়েছে।

খেলার শেষে পেলের হাঁটুর অবস্থা সাঙ্ঘাতিক খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। হাঙ্গেরির সঙ্গে ব্রাজিলের জরুরি খেলাটিতেও সে খেলতে না পারায় টিমে নৈরাশ্য এলেও পর্তুগালের সঙ্গে 'কর-অথবা-মর' এই জিদের খেলায় পেলে খেলতে নামে। এবারেও খেলা পরিচালনা করেছিল শেফিল্ডের রেফারি জর্জ ম্যাককেব। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পর্তুগীজ ডিফেণ্ডার মোরের কাছে আবার চোট খেয়ে পেলে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

দঃ আমেরিকার সমর্থকরা তখনিই আবার জোরের সঙ্গে বলেছে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে জার্মান রেফারির পরিচালনা এবং পর্তুগালের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের খেলায় ইংরাজ রেফারিই ছিল নাটের গুরু।

যারাই পেলে ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের প্রতি ব্যবহারের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করেছে তাদের অনেকেরই প্রতিবাদকারীর উপর সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। সেরা খেলোয়াড়দের মধ্যে আরও অনেকের উপর এত ভীষণভাবে অত্যাচার করা হয়েছে যে খেলার মান চিলির অনুষ্ঠানের চেয়ে কোন মতেই উপরে যায়নি। এবং সেইরকমই আচারণবিধির মানও ছিল অনুরূপ ভাবে খারাপ। ঘটনার দিকে লক্ষ্য করে প্রসঙ্গত দঃ আমেরিকানরা আরও জানায় যে সারা অনুষ্ঠানে পাঁচজন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করা হয়েছিল তাদের ভিতরে চারজনই ছিল দঃ আমেরিকান।

পেলের উপর যা করা হয়েছে তাতে যে কোন লোকেরই প্রভুত সমবেদনা থাকবে। কিন্তু সত্যি কথা হল ব্রাজিলের এধরনের নিচু মানের প্রতিযোগিতায়ও জেতার সক্ষমতা ছিল না। তারা পেলের উপর অতিমাত্রায় নির্ভর করেছিল। গ্যারিঞ্চাও ছিল নিষ্প্রভ। ওদের রক্ষণভাগে বুড়ো প্লেয়ারের আধিক্য ঘটেছে এবং নবাগতের মধ্যে একমাত্র তোস্তাওকেই ওয়ার্ল্ড কাপের খেলায় উপযুক্ত মনে হয়েছে।

স্মরনীয় ম্যাচ ঃ ব্রাজিল—হাঙ্গেরি

গুডিসন পার্কে যে ম্যাচটিতে ব্রাজিল হাঙ্গেরির কাছে ৩—১ গোলে হারে সেটি ছিল প্রতিযোগিতার সেরা ম্যাচ। পেলে না থাকলেও ৫১,৩৮৭টি দর্শক সত্যিকারের ফুটবল দক্ষতা কাকে বলে তা তারা দেখেছে। এই স্মরণীয় খেলায় দুটি মনে রাখার মত গোল হয়েছে। তিন মিনিটের মাথায় হাঙ্গেরির বেনে পেনাল্টি এরিয়ায় ঠাসা ভিড়ে দুজন ব্রাজিলের প্লেয়ারকে কাটিয়ে জোরালো শটে প্রথম গোলটি করে।

সিকি ঘণ্টা বাদে তোস্তাও গোল শোধ করে দেয়। এর পরেই পয়ষট্টি মিনিট পর্যন্ত খেলাটির ভারসাম্য সূক্ষ্মতায় ছুরির বুকের উপর থেকেছে। অনুষ্ঠানের সেরা গোলটি করে হাঙ্গেরি। অ্যালবার্ট ডান ধারে বেনের কাছে বল পাঠালে সে বল নিয়ে এগোতে থাকে, এদিকে ফ্যারাকাস মাঝখান ফুঁড়ে ঢুকে পড়েছে। বেনে ত্রিশ গজ দূর থেকে দৌড়ে আসা ফ্যারাকাসকে সেণ্টার করলে সে ভলি মেরে গোল করে।

এই অবিশ্বাস্য গোল করতে হাঙ্গেরি টিম যে রকমের নড়া-চড়া করেছে তাতে সবাই ভেবেছে হাঙ্গেরি হয়তো টুর্ণামেণ্ট জিতে

নেবে। হয়তো তারা পারতো কিন্তু গোল কীপারের ত্রুটিতে তারা কোয়ার্টার ফাইনালে রাশিয়ার কাছে হেরে যায়।

ইংল্যাণ্ডের জোরালো রক্ষণ ব্যূহ

ইংল্যাণ্ড ওই প্রতিযোগিতায় জিতেছে কারণ তারা বিশ্বের সেরা ফুটবল পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হয়ে জান দিয়ে খেলেছিল। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় ডিফেন্সের ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ড অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ায় তাদের রক্ষণভাগ যে কোন টিমকে টেক্কা দিয়েছে। উরুগুয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচটি ছিল দাবা খেলার এক অনুপম সংস্করণ। ইংল্যাণ্ড উরুগুয়ের প্রতিরোধকে ভাঙার চেষ্টা চালিয়েছে। জন কনেলির মত উইং ফরোয়ার্ডের উপস্থিতি সত্বেও ইংল্যাণ্ড প্রথমে পেরে ওঠেনি। গোলশূন্য ভাবে খেলা শেষ হতেই চারিদিকে নেমেছে হতাশার ছায়া।

ফ্রান্স মেক্সিকোর সঙ্গে ড্র করে এবং পরে উরুগুয়ের কাছে হেরে যায়। ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ড মেক্সিকোর সঙ্গে খেলার আগেই উরুগুয়ে তিন পয়েন্ট পেয়ে এগিয়ে যায়।

ইংল্যাণ্ড দলে কনেলি'র বদলে ঢুকেছে টেবি পেইন। তখন অ্যালান বলের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে মার্টিন পিটার্স। তবুও ববি চার্লটন পথ না দেখানো পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের পক্ষে স্কোর করা খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চার্লটন এক চমকপ্রদ গোল করার পরে গ্রিভসের কাছে বল পাঠায়, সেই থেকেই দ্বিতীয় গোল করে হার্স্ট।

এরপরে ফ্রান্স গেছে ওয়েম্বলিতে। ইংল্যাণ্ড সাবেকি উইংম্যানের উপর নির্ভর করে খেলতে যে বদ্ধপরিকর তা প্রমাণ করার জন্যে ঠিক করল বি ক্যালাঘ্যান খেলবেই খেলবে। একমাত্র ইংল্যাণ্ড টিমই ২-০ গোলে জিতে কোন গোল না খেয়ে পেঁাছয় কোয়ার্টার ফাইনালে।

খোলাখুলি বলতে গেলে বলতে হয় যে মাত্র পাঁচ মিনিট ছাড়া ফ্রান্সের হার্বিন আঘাতে ছটফট করেছে এবং খেলা শেষ হওয়ার সিকি ঘণ্টা আগেই সাইমনকে তুলে নেওয়ায় ফ্রান্স দুর্বল হয়ে যায়। সাইমন যখন চোট পেয়ে মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছিল সে সময়ই ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের রক্ষনব্যূহ ভেদ করে ঢুকে পড়ে। ক্যালাঘানের সেণ্টার থেকে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় গোলটি করে হাণ্ট। প্রথম গোলটিও করেছিল ওই হাণ্ট।

ভয়াবহ কোয়ার্টার ফাইনাল

অতএব আর্জেণ্টিনার সঙ্গে সেই ভয়াবহ কোয়ার্টার ফাইনাল। এই খেলায় দক্ষিণ আমেরিকানরা যদি একান্ত ঠাণ্ডা মাথায় থাকত তবে তাদের জয় আটকায় কে? ওদের সূচনায় ভাল খেললেও অকস্মাৎ মাথা গুলিয়ে ফেলেছে। সমাপ্তির তের মিনিট আগে পিটার পোঙের কাছ বরাবর সেণ্টার করতেই হাণ্ট ওই ম্যাচের একমাত্র গোলটি করার সৌভাগ্য অর্জন করে।

পর্তুগাল ও মেক্সিকোর খেলায় দুটো টিমই প্রকৃত ফুটবল খেলার পরিচয় রাখায় খেলাটি হয়েছে বেশ চটকদারী। হাণ্টের শট্ পর্তুগীজ গোলকীপার ধরতে না পারায় ববি চার্লটন ছুটে গিয়ে স্কোর করলে হাফ টাইমের সময় ইংল্যাণ্ড এক গোলে এগিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে পর্তুগাল ভালই খেলছিল তবু চার্লটন এই ম্যাচের দ্বিতীয় গোলটি দেয়।

মনে হয়েছিল ইংল্যাণ্ড জিতবেই কিন্তু পর্তুগাল ঝড়ের গতিতে সমাপ্তি টেনেছে। যখন খেলা শেষের আর আট মিনিট বাকি পেনাল্টি শটে ইউসেবিও গোল করেছে। এরপরে? এবং ইংল্যাণ্ড যা আগে কোনদিন সহ্য করে সেই দীর্ঘতম আট মিনিটের অতিরিক্ত সময়ে খেলতে বাধ্য হল। সারা স্টেডিয়াম অনবরত চিৎকার চলেছে!

ইংল্যাণ্ড! ইংল্যাণ্ড! ইংল্যাণ্ড ডিফেণ্ডাররা তাদের ব্যাকদের দিয়ে দেওয়াল তৈরি করল। তারা যেন আর একটি কেন—দুটি গোল খাওয়ার সম্ভাবনা থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে থাকলেও অনেকেই ভাবল পর্তুগাল হয়তো আরও একটি পেনাল্টি পেতে পারে। রেফারির হয়তো অন্য ধারণা ছিল তাই ইংল্যাণ্ড জিতেছে ২-১ গোলে।

ফাইনাল খেলাটি যেন স্মৃতিতে ভাসছে। পঃ জার্মানির লোকেরা এখন জোর করে বলে তাঁদের বিপক্ষে তৃতীয় গোলটি দেওয়া ঠিক হয়নি কারণ বলটা নাকি গোল লাইনই পেরোয়নি। এখনো সবরকমের সাক্ষ্য খাড়া করা হয়। কারো পক্ষে গোল বলাও সম্ভবও নয় কারণ বলটা কোন মতেই গোল লাইন পেরোয়নি। মায় লাইন্সম্যানের সঙ্গেও পরামর্শ করা হয়নি। যখন ঘটনাটি ঘটে লাইন্সম্যান তখন গোল লাইন থেকে মাত্র বারো গজ দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। আরও কথা রেফারির সঙ্গে তার সাধারণ ভাষার যোগাযোগ ছিল না—সেজন্যেই ওরা দুজনে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পারেনি।

যাহোক রোজার হাণ্ট গোলের কাছে দাঁড়িয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে হাত তুলেছে। সত্যিই যদি কোন সন্দেহ থাকে তবে হাণ্ট নিজেই গিয়ে তার সম্বন্ধে নিশ্চিত হত?

তাহলে হয় ন্যায্য গোল অথবা ন্যায্য গোল নয়। এটাও দেখার বিষয় যে জন্য অতিরিক্ত সময় খেলানো হল সে গোলের সম্পর্কে বিলাপকারীরা চুপচাপ থেকে গেছে! শেষ মিনিটে এই গোলটি করেছিল পঃ জার্মানি। জ্যাক চার্লটনের নামে ফাউল দেওয়া হলেও আসলে কিন্তু ওকেই ফাউল করা হয়েছিল। ফ্রি কিকের সময়ে অতি সহজে বলটি হাতে করে টেনে এনে পঃ জার্মানি গোল ইংল্যাণ্ড প্লেয়াররা প্রতিবাদ জানালেও রেফারি গোল মঞ্জুর করেছে। সবাপেক্ষা সন্দেহ যুক্ত গোলটিও হয় অতিরিক্ত সময়ে।

ইংল্যাণ্ড

পুল ১

ইংল্যাণ্ড : ০
উরুগুয়ে : ০

ফ্রান্স : ১ হসার
মেক্সিকো : ১ বোর্জা

উরুগুয়ে : ২ রোচা, কর্টেস
ফ্রান্স : ১ ডি বুর্জোইং

ইংল্যাণ্ড : ২ ববি চার্লটন, হান্ট,
মেক্সিকো : ০

মেক্সিকো : ০
উরুগুয়ে : ০

ইংল্যাণ্ড : ২ হান্ট
ফ্রান্স : ০

কে ? কোথায় ?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
ইংল্যাণ্ড	৩	২	১	০	৪	০	৫
উরুগুয়ে	৩	১	২	০	২	১	৪
মেক্সিকো	৩	০	২	১	১	৩	২
ফ্রান্স	৩	০	১	২	২	৫	১

পুল ২

পঃ জার্মানি ঃ ৫ বেকেনবাওয়ের (২) হ্যালার ২ (১ পেনাল্টি) হেল্ড
সুইজারল্যাণ্ড ঃ ০

আর্জেন্টিনা ঃ ২ অ্যার্টাইম (২)
স্পেন ঃ ১ পিরি

স্পেন ঃ ২ স্যাঁশিস, অ্যাম্যানসিয়ো
সুইজারল্যাণ্ড ঃ ১ কোয়েন্টিন

আর্জেন্টিনা ঃ ০
পঃ জার্মানি ঃ ০

আর্জেন্টিনা ঃ ২ অ্যার্টাইম, ওনেগা
সুইজারল্যাণ্ড ঃ ০

পঃ জার্মানি ঃ ২ এমারিখ, সেলার
স্পেন ঃ ১ ফাস্তে

কে? কোথায়?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
পঃ জার্মানি	৩	২	১	০	৭	১	৫
আর্জেন্টিনা	৩	২	১	০	৪	১	৫
স্পেন	৩	১	০	২	৪	৫	২
সুইজারল্যাণ্ড	৩	০	০	৩	১	৯	০

পুল ৩

ব্রাজিল ঃ ২ পেলে, গ্যারিঞ্চা
বুলগেরিয়া ঃ ০

পর্তুগাল ঃ ৩ জো অগাস্টো (২) টোরে
হাঙ্গেরি ঃ ১ বেনে

হাঙ্গেরি ঃ ৩ বেনে, ফার্কাস, মেৎজোলি (পেনাল্টি)
ব্রাজিল ঃ ১ তোস্তাও

পর্তুগাল ঃ ৩ ভুৎসভ (নিজগোলে) ইউসেবিও, টোরে
বুলগেরিয়া ঃ ০

পর্তুগাল ঃ ৩ ইউসেবিও (২) সাইমোজ
ব্রাজিল ঃ ১ রিল্ডো

হাঙ্গেরি ঃ ৩ ডাভিডোভ (নিজগোলে) মেৎজোলি, বেনে
বুলগেরিয়া ঃ ১ আস্পেরুখোভ

কে ? কোথায় ?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
পর্তুগাল	৩	৩	০	০	৯	২	৬
হাঙ্গেরি	৩	২	০	১	৭	৫	৪
ব্রাজিল	৩	১	০	২	৪	৬	২
বুলগেরিয়া	৩	০	০	৩	১	৮	০

পুল ৪

রাশিয়া ঃ ৩ ম্যালোফিভ (২), ব্যানিসেভেস্কি
উঃ কোরিয়া ঃ ০

ইতালি ঃ ২ ম্যাজোলা, ব্যারিসন
চিলি ঃ ০

চিলি ঃ ১ মার্কো (পেনাল্টি)
উঃ কোরিয়া ঃ ১ পাক সিয়াঙ জিন

রাশিয়া ঃ ১ চিসলেংকো
ইতালি ঃ ০

উঃ কোরিয়া ঃ ১ পাক ডু ইক
ইতালি ঃ •

রাশিয়া ঃ ২ পর্কুজান (২)
চিলি : ১ মার্কো

কে? কোথায়?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্ব	বিঃ	পয়েন্ট
রাশিয়া	৩	৩	০	০	৬	১	৬
উঃ কোরিয়া	৩	১	১	১	২	৪	৩
ইতালি	৩	১	০	২	২	২	২
চিলি	৩	০	১	২	২	৫	১

কোয়ার্টার ফাইনাল

ইংল্যাণ্ড ঃ ১ হার্স্ট
আর্জেন্টিনা ঃ ০

পর্তুগাল ঃ ৫ ইউসেবিয়ো (৪, ২ পেনাল্টি) জো অগাস্টো
উঃ কোরিয়া ঃ ৩ পাক সিয়াং জিন, লি ডং উন, ইয়াং স্যাং কুক্

রাশিয়া ঃ ২ চিসলেঙ্কো, পর্কুজান
হাঙ্গেরি ঃ ১ বেনে

পঃ জার্মানি ঃ ৪ হেল্ড, বেকেনবাওয়ের, সীলার, হ্যালার
উরুগুয়ে ঃ ০

সেমিফাইনাল

ইংল্যাণ্ড ঃ ২ ববি চার্লটন ২
পর্তুগাল ঃ ১ ইউসেবিও (পেনাল্টি)

পঃ জার্মানি ঃ ২ হ্যালার, বেকেনবাওয়ের
রাশিয়া ঃ ১ পর্কুজান

তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণায়ক খেলা

পর্তুগাল ঃ ২ ইউসেবিও (পেনাল্টি) টোরে
রাশিয়া ঃ ১ ম্যালোফীভ

ফাইনাল

ইংল্যাণ্ড ঃ ৪ হার্স্ট (৩) পিটার্স
পঃ জার্মানি ঃ ২ হ্যালার, ওয়েবার (অতিরিক্ত সময়ে)

সবশেষে কে? কোথায়?

প্রথম—ইংল্যাণ্ড, দ্বিতীয়—পঃ জার্মানি, তৃতীয়—পর্তুগাল, চতুর্থ—রাশিয়া।

মেক্সিকোয় নাটকীয়তায় ভরা নবম ওয়ার্ল্ড কাপ

মেক্সিকোয় সত্তরের ওয়ার্ল্ড কাপ চলাকালীন নানা ছবির উপর দৃষ্টি দিতে দিতে হঠাৎ একটা ছবি দেখতে গিয়ে অজান্তে বেশি সময় দিয়ে ফেলেছি। ছবিটি তোলা হয়েছিল ইংল্যাণ্ড ও পঃ জার্মানির কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা শেষে। পঃ জার্মানির কাছে হঠাৎ ৩-২ গোলে হেরে যাওয়ায় পরাজিত ইংল্যাণ্ড অধিনায়ক ববি মুর ও কোচ র‍্যামজে কতটা ব্যথিত হয়েছে তা ওই ছবিতেই ভালভাবে প্রকাশিত।

কেশবিরল ববি মুরের কপাল বেয়ে বটের ঝুড়ির মত কয়েক গাছা চুল নেমেছে। ঘাড় হেঁট করে থাকা মুর নিজের দলের পরাজয়ের গ্লানি ও দীর্ঘ দু'ঘণ্টা ধরে পণ্ডশ্রমের জগদ্দল ঠেলে আর যেন মাথা তুলতে অক্ষম। ওর পাশেই র‍্যামজে দাঁড়িয়ে। র‍্যামজের কপালে পরিচিত তিনটি ভাঁজ জেগে উঠেছে। ঘন কালো ভ্রু দুটো খুব কাছাকাছি থাকায় র‍্যামজে কি বলতে চাইছেন তা আর উচ্চারণ করে বলার দরকার হয়নি। র‍্যামজের চোখ থেকে যে চাউনি মুরের প্রতি ঠিকরে পড়েছে—তাতে রয়েছে মৌন নালিশ। হুবহু ওই ছবিটাই দেখেছিলাম ওয়েম্বলিতে, ছেষট্টিতে। তখন ইংল্যাণ্ডের ওয়ার্ল্ড কাপ·বিজয় সমাধা হয়েছে। আবেগের ওজন ববি ও র‍্যামজের ওপর এতটা চাপের সৃষ্টি করেছে যে, তখনো ওরা একে অপরের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারেনি। কারো মুখে কথাও ছিল না।

কঠিন শপথ—ইংল্যাণ্ডকে হারাবই

অলক্ষ্যে ওইখান থেকেই সত্তরের ওয়ার্ল্ড কাপ সুরু হয়েছিল, ইংল্যাণ্ড বাদে অন্য ফুটবল দেশগুলি শপথ নিয়েছে—আগামী সত্তরের

ওয়ার্ল্ড কাপে ইংল্যাণ্ডকে বিশ্বের ফুটবল সিংহাসন থেকে টেনে নামাতেই হবে।

যদিও চার বছরের অনুষ্ঠান, তবু মেক্সিকোতে এর নবম ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা আরম্ভ হওয়ার আগে ষোলটি গ্রুপের মধ্যে চোদ্দটি গ্রুপের খেলা চলেছে, দু'বছর ধরে। বাকি দুটো গ্রুপে মেক্সিকো আয়োজনকারী দেশ হিসাবে এবং ইংল্যাণ্ড আগের অনুষ্ঠানের বিজয়ী হওয়ায় মূল ফাইনাল পর্যায়ে যে খেলবেই—এ কথাটা ছিল একরকম পাকা হিসাব।

চোদ্দটি গ্রুপে অজস্র ঘটনার সমন্বয়ে শেষ হওয়া খেলা গুলোর প্রতিটির উপর আলাদা করে আলো ফেলতে হলে—শেষে হয়ে দাঁড়াবে এক মহাভারত প্রমাণ ব্যাপার।

মরক্কো ও ইজরায়েলের দ্বন্দ্ব

রাজনৈতিক কারণে মরক্কো ও ইজরায়েলকে নিয়ে যে একটু মন কষাকষি চলছিল সেটা ওয়ার্ল্ড কাপে প্রাথমিক খেলা শেষে আবার মাথা চাড়া দেয়। এশীয় অঞ্চল হতে ইজরায়েল বিজয়ী হতেই ফিফা'র কর্মকর্তাদের টনক নড়েছে—আফ্রিকার বিজয়ী দেশ মরক্কো কি ইজরায়েলের সঙ্গে মেক্সিকোর মাঠে নামতে রাজি হবে?

ফিফা'র সভাপতি স্ট্যানলি রাউস নিজেই দু কলম লিখে মরক্কোর মতামত জানতে চান। মরক্কোর কাছ থেকে উত্তর না আসা পর্যন্ত সকলেই ভাবাতুর হন—তবে কি মরক্কোর গ্রুপের দ্বিতীয় টিম নাইজেরিয়াকে ডাক দিতে হবে।

ওই রাজনীতির ব্যাগড়া আর একটি প্রাথমিক পর্যায়ের খেলাতেও বাধা দিয়েছে, সিওলে এশীয় অঞ্চলের খেলা খেলতে রোডেসিয়াকে যেতে না দেওয়ায় আস্ট্রেলিয়াকে বাধ্য হয়েই সাব-গ্রুপ ম্যাচ খেলতে মোজাম্বিকে ছুটতে হয়েছে। এই বাবদ অস্ট্রেলিয়ার ফালতু খরচ হয়েছে—পনের হাজার পাউণ্ড।

ওই ধরনের হুজ্জুত থেকে মধ্য আমেরিকার সাব-গ্রুপের খেলাও বাদ যায়নি। ওখানে এল সালভাদর ও হণ্ডুরাসের খেলা নিয়ে প্রায় পুরোদমে লড়াই ঘনিয়ে উঠেছিল।

ওয়ার্ল্ড কাপের নতুন চিন্তা

এই ধরনের ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে প্রস্তাব হয়েছে—আন্তর্মহাদেশীয় ফুটবল কাপ চালু করাই হবে মহৌষধ। যেমন ইউরোপে ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা চলে। দেখা গেছে যে ভাবে সত্তর পর্যন্ত প্রাথমিক খেলা গুলো চলেছে তাতে ফুটবল দক্ষতার চেয়ে ভৌগলিক অবস্থানের বাধাটাই বড় হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কথা আসে, ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা শুধু 'টস' করে সমাধান দেওয়ার পদ্ধতিটাও ভালরকম মেনে নেওয়া যায় কি না। অঢেল টাকা, সময়, ইজ্জত খরচ করে সামান্য মাত্র মুদ্রাক্ষেপণে হেরে বিদায় নিতে কোন দলেরই বা ভাল লাগে। এই সত্তর পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড কাপ যে পদ্ধতিতে চলেছে তাতে যে কোন দেশের পক্ষে একটি গোল না করেও টুর্নামেন্ট জেতা অসম্ভব নয়। এজন্যেই সকলের আশা—চুয়াত্তরে ম্যুনিখের জন্য ওয়ার্ল্ড কাপ খেলায় পরিবর্তন আসবেই আসবে। ওই কারণেই ফিফা ২৪টি দল নিয়ে ফাইনাল পর্যায়ের খেলা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মেক্সিকোর বিশ্ব কাপ ফুটবলের সমস্যা হিসাবে বলা হয়েছিল—অত্যধিক উত্তাপ ও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চাবস্থান মেক্সিকোর অসুবিধা সৃষ্টি করবে, এছাড়াও রেফারির পরিচালনায় ইউরোপে ও দঃ আমেরিকার ফুটবল দেশগুলির মধ্যে সমঝোতা আনাই হবে মহা দায়।

ওই সব ঝামেলাগুলো সরিয়ে আবার প্রথম প্রসঙ্গে ফিরছি, কারণ মরক্কোর নাম প্রত্যাহার নিয়ে যে ভাবে চিন্তা করা হয়েছিল—তা বেশিদূর গড়ায়নি—মরক্কো সত্তরের মেক্সিকো অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক শুচিবাই গ্রস্ততার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি।

উইলিয়াম হিল ও কমপিউটার—দুই বিফল গণতকার

মেক্সিকোর মাঠে সবাই হাজির হওয়ায় আগে ইংল্যাণ্ডের বাজি লড়নেওয়াল উইলিয়াম হিল তার বাজির ফলাফল থেকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড পায়। ওই বাজির ফলাফল বলেছিল: ইংল্যাণ্ড জিতবে। কারণ ইংল্যাণ্ডের পক্ষে বাজির হিসাব দাঁড়ায় ৩-১। ব্রাজিলের পক্ষে ৭-২, ৬-১ ইতালি, ৯-১ উরুগুয়ে ও পঃ জার্মানির পক্ষে। এদিকে কমপিউটার দাবি রেখেছে ইংল্যাণ্ড ও ব্রাজিলের জেতার সম্ভাবনাই সর্বাধিক।

ফাইনাল পর্যায়ে যাবার ঠিক আগে ষোলটি দলের গ্রুপ আলোচনায় তাদের শক্তির উনিশ বিশ নিয়ে ভেবে দেখা হয়েছে।

এই পূর্বাভাষের কথায় পয়লা নম্বর গ্রুপে মেক্সিকো, রাশিয়া বেলজিয়াম ও এল সালভাদরের মধ্যে রাশিয়াকে পুরোধা মেনে মেক্সিকো ও বেলজিয়ামের সম্পর্কে বলা হয়েছে—এই দু দেশের পক্ষে গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান পাওয়া আশ্চর্যের কথা নয়। এল সালভাদর তাদের টিমে ম্যারিওনার মত শক্ত ডিফেন্স ও র‍্যামোন মার্টিনেজের মতো অনুরূপ আক্রমনাত্মক খেলোয়াড় পেয়েও ওই প্রথম তিনটি দলের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না—এটাই ছিল স্বাভাবিক ধারণা।

রাশিয়া নিশ্চিন্ত, মেক্সিকো উদ্বিগ্ন

প্রথম গ্রুপের খেলার জন্যে রাশিয়া ৪-২-৪ ছককে শিরোধার্য করে সেণ্টার হাফ অধিনায়ক সেসতারনেভের উপরে রক্ষণভাগের সিং-দরজায় পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ওদের আক্রমণ চালনার কাজে সেনাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় অ্যানাতলি বাইশোভেটসের কাঁধে। তবে দল কেমন খেলবে কিভাবে আক্রমণ করবে, সব পন্থাই ঠিক করেছেন সেই অভিজ্ঞতাপুষ্ট পরিচিত মুখ—গ্যাভরিল ক্যাশালিন।

নিজেদের মাঠে মান রাখার তাগিদে মেক্সিকো বিশেষ চিন্তিত হয়ে

পড়ে, ওদের ভীতুমির কারণ,—উনসত্তর সালের ইউরোপ সফরে ওরা মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। ওই ভাঙা মনোবল জীইয়ে রাখার জন্যে ঠিক করেছিল সামনে চারজন ফরোয়ার্ড সাজিয়ে পিছনে তিনজনের ত্নটি দেওয়াল করে গোলের কেল্লা বাঁচানোই হবে শ্রেষ্ঠ কারসাজি। আক্রমণের সারিতে ফার্গোসো নেতৃত্ব দেবে আর রক্ষণ কার্যে দৃঢ়তা সম্পাদন করবে ম্যারিও পেরেজ।

দ্বিতীয় গ্রুপে ইতালির সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে 'ভেরি গুড' সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল। শুধু 'গুড' কথাটি পেয়েছিল সুইডেন। পূর্বাভাষে বলা হয় মাঝারি ধাঁচের খেলা দেখাবে উরুগুয়ে,—এবং ইজরায়েলের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ইতালি

ইতালির ফুটবল তারকাদের মধ্যে রিভা, গিয়ানি রিভেরা, পিরিনো প্রাতি ও গিয়াসিন্টো ফ্যাচেত্তিকে ধরেই আশা ভরসার দোলানি চলেছে। ইতালির খেলার স্টাইলে বিশেষ বৈশিষ্ট্য সত্তরের প্রস্তুতিতেও বাদ যায়নি। এই বৈশিষ্ট্যটি বজায় রাখতে দম আটকানো একঘেয়ে খেলার সঙ্গে মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার মত আচমকা আক্রমণের পদ্ধতিকে খেলোয়াড়রা মুখস্থ করেছে। তবে ইতালি আগাম আত্মবিশ্বাস মজুত করেছে প্রাথমিক ম্যাচ গুলোয় ভালো খেলে।

মেক্সিকোর ওয়ার্ল্ড কাপের একবছর আগে সুইডেন টিম ১২টার মধ্যে ১০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ জিতে এক সুস্পষ্ট ছবি আঁকতে পেরেছিল, তারা মেক্সিকোতে নিশ্চিত ভাল ফলাফল করবেই। ওদের কোচ ওভার বার্গমার্কের আক্রমণাত্মক ফুটবল পলিশি সম্ভাবনার ছবিটি হাজির করতে পেরেছে। তবে কোচের একমাত্র অসুবিধা ছিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা সুইডেনের খেলোয়াড়দের

কিভাবে একত্রিত করা যায়। এই ছড়িয়ে থাকার মস্ত কারণেই সুইডেনে পেশাদারী ফুটবল চালু করা যায়নি।

প্রায়শঃ ওই রকমের ঘরোয়া ছন্নছাড়া অবস্থার জন্যে এককালের নামকরা টিম উরুগুয়ের টিমেও শান্তি ছিল না। ন্যাশনাল ও পেনারোল প্রমুখ দুটি ক্লাবের একগুঁয়েমির ফলে ওদের কোন প্লেয়ারই উরুগুয়ে টিমে জায়গা পায়নি।—এতেও উরুগুয়ের প্রত্যাশা ছিল, রক্ষণব্যূহ আঁটোসাঁটো রেখে মাঝে মাঝে আক্রমণ চালালে সাফল্য অনিবার্য। এই আক্রমণ কার্যে পরিচালনার ভার পড়ে লুই কুবিল্লা ও জুলিও কর্টেজের উপর।

চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ—কে জিতবে?

'চ্যামপিয়ন গ্রুপ'—তিন নম্বরের নিশ্চিত ফলাফল সম্বন্ধে কেউ আগেভাগে না বলে আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতলবকেই শ্রেষ্ঠ পথ রূপে ভেবে নিয়েছিল। বুনো ওল ব্রাজিল ও বাঘা তেঁতুল 'ইংল্যাণ্ড' এর মোকাবিলায় কি ঘটতে পারে সেটাই ছিল অন্যতম প্রশ্ন। দুজনের সম্ভাবনাও ছিল 'ভেরি গুড'। প্লেয়ার হিসাবে ইংল্যাণ্ডের ফ্রান্সিস লী, ববি চার্লটন, অ্যালান বল, গর্ডন ব্যাঙ্কসের সঙ্গে ব্রাজিলের পেলে, তোস্তাও, জেয়ারজিনহো ও এডুর সংঘর্ষ। যার সারমর্ম দাঁড়ায়, ইউরোপীয় ফুটবল সম্মানের সঙ্গে দঃ আমেরিকার ফুটবল ইজ্জতের লড়াই। ব্রাজিলের আকাঙ্খা ইংল্যাণ্ডের শক্তিকে খর্ব করতে পারলেই তাদের চিরতরে জুল রিমে কাপ পাওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। ইংল্যাণ্ড চেয়েছে '৬৬-র বিজয়ের পুনরাবৃত্তি করে তারা প্রমাণ করবে যে '৬৬-র বিজয়ে তারা কোন অন্যায়ের আশ্রয় নেয়নি।

ওদের পিছু পিছু চেকশ্লোভাকিয়া ও রুমানিয়ার সাফল্যকে নিয়ে কারোর মুখেই বড় একটা কথা শোনা যায়নি। তবুও চেকশ্লোভাকিয়ার ভিক্টর, ভ্যাসন্যাক যদি জোসেফ অ্যাডম্যাকের সহযোগীদের সুবিধা মত বল জোগাতে পারে তবে—কি হয় বলা কঠিন।

সব গণনার বাইরে—পঃ জার্মানি

সম্ভাবনা অনুযায়ী পঃ জার্মানি চার নম্বর গ্রুপকে সাজানো হয়েছিল—পঃ জার্মানি, পেরু, বুলগেরিয়া ও মরক্কো। পঃ জার্মানির আশা ভরসায় মুলার, ওভারাথ, বেকেনবাওয়ের ও লিবুদাকে সামনে রেখে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ওদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথাও সোচ্চারে ঘোষিত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় অধিনায়ক সীলারকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। অথচ ওই সীলারই এবারের ওয়ার্ল্ড কাপে জার্মানির টিমে শতকরা পঞ্চাশ ভাগের মত আক্রমণের ইন্ধন জুগিয়েছে। জার্মান দল স্বপ্নেও ভাবেনি, আফ্রিকার অখ্যাত টিম মরক্কোর বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় নাকানি চোবানি খেতে হবে। গোটা পঃ জার্মান টিম সম্বন্ধেও কেউ ভবিষ্যদ্বানী রাখেনি, তারা কোয়ার্টার ফাইনালে হারতে হারতেও ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে দেবে।

এর চেয়েও অবিশ্বাস্য টিম পেরু। মানসিক দিক থেকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ওই টিমটি, কেমন ভাবে শক্ত ধাত বজায় রেখে কোয়ার্টার ফাইনালে হাজির হবে—এ হিসাবও কোন ফুটবল গনতকার দিতে পারেনি।

সূচনাতেই চমক

ওই রকম অজস্র নাটকীয়তায় ভরা সত্তরের বিশ্ব কাপ ফুটবল। চমক লেগেছে প্রথম দিন একত্রিশে মে-র প্রারম্ভিক লগ্নেই। অ্যাজটেক স্টেডিয়ামের আকাশে লাল, সবুজ, সাদা, বেলুনেরা যখন ভেসে বেড়াচ্ছে, তখনও সুইডেন টিম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে কিনা জানতো না। স্টেডিয়ামে যাওয়ার পথে দারুণ ট্র্যাফিক জ্যাম। অগত্যা ওরা যে যার মোটর থেকে নেমে আগ্নেয় শিলা স্তূপের বন্ধুর পথ ধরে হাঁফাতে হাঁফাতে স্টেডিয়ামে পৌঁছেছে। দর্শকদের চোখে রঙচঙে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মোহ বেশিক্ষণ থাকেনি। রাশিয়া

ও মেক্সিকোর প্রথম ম্যাচে জারমান রেফারি সেশেনশারের অত্যধিক বাঁশি বাজানোয় খেলায় শান্তি বজায় থাকলেও ফ্রি কিকের আধিক্য খেলার স্বাভাবিক গতিকে বাধা দিয়েছে। এই খুঁতখুঁতে খেলা চালানোর জন্যে সমূহ দোষ রেফারির ঘাড়ে চাপানো যাবে না। রেফারির সমর্থনে পেরুর কোচ ডিডি (ব্রাজিলের প্রাক্তণ খেলোয়াড়) বলেছেন—
কিছুদিন আগে থেকে ফুটবল ট্যাকটিকসে এত পরিবর্তন ও অবনতি ঘটেছে, তাতে ব্রিটেনে অনুষ্ঠিত গত (৬৬) বিশ্বকাপের খেলাগুলোকে ফুটবল খেলা বলাই চলে না। এর শিকার হয়েছে ভাল ফুটবলাররা, যারা সত্যিকারের ফুটবল খেলতে আগ্রহী, এর বড় উদাহরণ পেলে। এখন বেশির ভাগ খেলোয়াড়েরই একমাত্র চিন্তা—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। মজার কথা, এত সব অসদাচরণ দেখেও প্রায় টিমের ম্যানেজার ও কোচ চোখ বুঁজে প্রায়শ প্রসঙ্গটিকে এড়াতে চান।

গুয়াদালাজারায় ব্রাজিল ও ইংল্যাণ্ড

মেক্সিকো সিটিতে যখন প্রথম ম্যাচ চলেছে, তখন গুয়াদালাজারায় ইংল্যাণ্ড ও ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা যে যার ঘরে টেলিভিশনে ওই খেলা দেখছিল। এরও কিছুক্ষণ আগে সকালের দিকে অ্যাটলাস ক্লাব মাঠেই রুমানিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে নামার আগে র‍্যামজে একটি শেষ ট্রায়াল ম্যাচের ব্যবস্থা করেন। যাদের প্রথম টিমে আসার কথা, তাদের বিরুদ্ধে বাকি এগারোজনের 'ছায়া একাদশ'-এর ফুটবল ম্যাচ। এতে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে, দ্বিতীয় টিম ৪—৩—৩ ছকে প্লেয়ার সাজিয়ে খেলে সম্ভাব্য একাদশের ৪—৪—২ ব্যূহ ভেঙে ৩—১ গোলে জেতে। খেলা শেষে র‍্যামজে একটুও ক্ষুণ্ণ না হয়ে বলেন, "আমি খেলা দেখে খুশি হয়েছি। দ্বিতীয় দলের কয়েকজন নিজেদেরকে প্রথম দলের যোগ্য প্রমাণিত করার জন্যেই অত্যধিক খেটে খেলেছে।"

ব্রাজিলের শিবিরে ওয়ার্ল্ড কাপে জয়লাভের বিষয়ে জোর

দিয়ে বলা হয়—ব্রাজিল জিতবেই। এতে 'যদি' যোগ করার কোন দরকার নেই। ১৪ বছরের পুরনো ৪—২—৪ এর ধাঁচে ব্রাজিল আর রাজি নয়। তাদের নতুন ব্যূহ ৪—৩—৩। তারা নিজেদের আক্রমণের ধার সম্বন্ধে এতটা বিশ্বাসী প্রতি ম্যাচে ব্রাজিল তিন গোল করবেই। ওদের একমাত্র সমস্যা গোলকীপারকে নিয়ে। কখন বল গলিয়ে দেবে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

নতুন আইন—হরেক বাধা

খেলা কিভাবে চালানো হবে—এই আলোচনায় ইউরোপ ও দঃ আমেরিকার ফুটবল আইনজ্ঞদের মধ্যে কথা কাটাকাটির শেষে ঠিক হয়ঃ বিপক্ষের দিকে পিছন করে বল ধরে থাকা প্লেয়ারকে চার্জ করতে হলে আক্রমণকারী খেলোয়াড় পিছন থেকে বল কেড়ে নেওয়ার সময় খেলোয়াড়ের পায়ের উপর কোন বাধা সৃষ্টি না করে অনায়াসে বল কেড়ে নিতে পারবে। কর্ণার কিকের সময় গোলকীপারের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে অনর্থক তার দৃষ্টিপথে বাধা সৃষ্টি করা চলবে না। এই দোষটা ববি চার্লটনের স্বভাবেই বেশি দেখা গেছে। ফ্রি কিক নেওয়ার সময় বাধাদানকারী খেলোয়াড়কে নিরস্ত করার দিকে আইনের কড়াকড়ি হবে। তবে মাঠের সাইড লাইন থেকে কোচদের উপদেশ বিতরণও আর চলবে না বলে ওই আলোচনায় স্থির হয়। কোন খেলোয়াড় আহত হলেই তাকে মাঠ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়াও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

অ্যাজটেক স্টেডিয়ামে খেলার সময় কালোবাজারীদের রুখবার জন্যে মেক্সিকো সরকার হুকুম জারী করেন, যদি কেউ কালোবাজারীর সঙ্গে জড়িত হয়ে ধরা পড়ে, তবে ৩৩০ পাউনড জরিমানা গুনতে হবে ও কারাবাস চলবে দুই সপ্তাহ ধরে। এত বাধা সত্ত্বেও ফুটবল পাগল লোকদের কিছু অংশ ওই কালোবাজারীদের কাছেই টিকেট কিনেছে।

যারা সুবিধা করতে পারেনি তারা অ্যাজটেক স্টেডিয়ামের গায়েতেই তাঁবুতে বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে দিন কাটিয়েছে—দৈবক্রমে যদি একটা টিকেট ওদের হাতে আসে!

ওয়ার্ল্ড কাপের খেলার সময় মেক্সিকোর দেওয়ালে পোসটার পড়েছে—"টাকিলা পানকারী ও পিস্তলধারী মেক্সিকানদের এ মিথ্যা অপবাদ থেকে এখন গা ঝাড়া দিয়ে ওঠার সময়।" ওই পোসটারে সামান্য একটু কাজও হয়েছে। একজন গরীব শ্রমিককে জিগ্গেস করা হয়েছিল, এত সব হৈ-চৈ তোমার কেমন লাগছে। সে অমনি ঘাড় নেড়ে বলে—আমি ও আমার বাড়ির সবাই তো খেলা দেখতে যাব বলে ভাবছি। মূলত সমস্ত ব্যাপারটাই ওই শ্রমিকের আকাশ-কুসুম কল্পনা।

পঃ জার্মানি প্রথম খেলাতেই নাচার

পঃ জার্মানির খেলোয়াড়ের সুনাম ও জার্মানির থেকে আসা আড়াই হাজার জার্মান দর্শকের কথা ভেবে জার্মানি-মরোক্কোর খেলার আগেই সবাই ধরে নেয় জার্মানি মরক্কোকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেবে। খেলার শুরুতেই জার্মান প্লেয়ারদের চলাফেরায় অস্বস্তি ধরা পড়েছে। অ্যাটলানটিকের অপর পারে জার্মানিতে টেলিভিশনে যারা খেলা দেখছিল তারাও জার্মান প্লেয়ারদের পায়ে বুট যে ঠিকমত লাগেনি, সেটা বুঝে যায়। প্রমাদগুনে খোদ পঃ জার্মানির সরকার টেলিফোনে কোচ হেলমুট শ্যোনকে নির্দেশ দেন, এ অঘটন ভবিষ্যতে যেন না ঘটে। ২—১ গোলে মান বাঁচান ফলাফলে হেরে মরক্কোর কোচ ব্যালগোটেয়েভ ভিদিনিক বলেন—"আমরা তো বিরাট কিছু করার জন্যে আসিনি, সে কথা আগেই জানতাম। তাহলেও আমাদের প্রস্তুতিতে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। মেক্সিকোর উচ্চতা (সাড়ে সাত হাজার ফুট) থেকে দেড় হাজার ফুট উঁচুতে আমাদের টিমের প্র্যাকটিশ হয়েছে। রোদে জ্বলা প্রান্তরেও খেলোয়াড়েরা করেছে কঠোর পরিশ্রম। টিমের প্রতিটি

প্লেয়ারকে যেভাবে তৈরী করেছি, তাতে দশজন খেলোয়াড় তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করে এসেই আবার অপরের আক্রমণ নষ্ট করে দিতে সক্ষম।" শোনা যায় এই খেলোয়াড়দের পিতারা একত্রে মক্কায় গিয়ে তাদের পুত্রদের প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপ অভিযানে সাফল্য কামনা করেছেন। কিন্তু মরক্কো গ্রূপের গণ্ডি ডিঙোতে পারেনি।

সেরা টিম পেরু

লিওনের মাঠে পেরুর খেলা ওয়ার্ল্ড কাপের ধীর গতি ছবিতে বাড়তি গতি দিয়েছে। কিন্তু এতটা হওয়া সম্ভব ছিল না। পেরুতে ভূমিকম্পের খবর পেয়েই অনেক প্লেয়ার বাড়ি চলে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে। পেরুর কোচ ডিডি ওদের সাস্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'এই দুর্দিনে জাতির মননে শক্তি যোগাতে তাদের খেলা জেতার বিশেষ প্রয়োজন।' বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে পেরু দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও তিন গোলে জেতার শেষে প্রত্যেক প্লেয়ারকে দেওয়া হয় ১২০০ পাউণ্ডের বোনাস। সঙ্গে সঙ্গে এই টাকাটা অনেকে দেশে পাঠিয়ে দেয় দুর্গতদের সাহায্যের জন্যে।

খেলা শেষে দর্শকরা রায় দেয়ঃ কুবিল্লাস তো বটেই ওই টিমের সব প্লেয়ারই চোস্ত ফুটবলার।

প্রশংসায় মুশকিল হয়েছে পেরু টিমের। চটপট কয়েকটি বিদেশী ক্লাব ওদের ৯।১০ জনকে নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করেছে। কোচ ডিডি-র সামনেও অনেকেই রেখেছে মোটা টাকার প্রস্তাব। বেলন ওলিওন ডাক পেয়েছে উরুগুয়ে থেকে। অধিনায়ক সেইতাজকে চেয়েছে আরজেনটিনা। তিওফিলো কুবিল্লাসকে দরকার মেক্সিকো অথবা আরজেনটিনার একটি ক্লাবের। ডিডি-র ডাক এসেছিল ব্রাজিলের বহু ক্লাবের তরফ থেকে। উত্তরে ডিডি জানায়, খেলার মাঠের 'ফটক প্রণামীর' শতকরা পাঁচ ভাগ তাঁকে দেওয়া হলে তিনি রাজি।

ডিডির প্রস্তাবে ও প্রান্ত থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। তাই মেক্সিকোর কোন ক্লাবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে হয়তো ডিডিকে গুয়াদালাজারা টলুকাতেই থাকতে হবে।

পেরুর দলের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য ফুটবলপ্রেমীদের পরিচয় করিয়ে দিতে পেরুর বেতার ভাষ্যকার লুই ওনিও বলেছেন—"আমাদের প্লেয়াররা তেমন টাকা পায় না। যদি ডিডি চলে যায় তবে আমরা ভীষণ বিপদে পড়ব। ডিডি একাই ওই টিম তৈরী করেছে। এর আগে আমাদের প্লেয়াররা ট্রেনিং বলতে কিছুই জানতো না। ডিডি-ই ট্রেনিংয়ের ধরা-বাঁধা নিয়মে ফেলে ওদের পেশাদারী বিবেক জাগ্রত করেছে। বাছাই রাউণ্ডের খেলায় আর্জেনটিনাকে হারানোর পরেই প্রতিটি প্লেয়ার ডিডি-র আজ্ঞাবহ হয়ে অসুরের মত খেটেছে।"

খেলা শুরুর আগে ইতালি টিমের কোচ ফেরুসিও ভ্যালক্যারেগি বলেছিলেন, "আমরা দেহ ও মনে এতটা প্রস্তুত যে ফুটবলের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পারব বলে উচ্চাশাও পোষণ করি।"

কিন্তু ইতালি টিমের খেলা দেখে সকলে এক মত হয় "ইতালির কথায় ও কাজে মিল পাওয়া যায়নি।" এই দলগত ব্যর্থতার গ্লানি যার গায়ে লাগেনি, সে হল লুইগি রিভা, ইতালির শ্রেষ্ঠ উইঙ্গার।

নতুন নায়ক—রিভা

রিভার এই অসাধারণত্বকে বাধা দিতে তার পিছনে প্রতি টিমে দু-তিনজন কড়া নজর রাখলেও রিভাকে রোখা যায়নি—এ দৃশ্যও দেখা গেছে, রিভা সুইডেনের অ্যালসেসনকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে বল বার করে নিয়েছে, তবু অ্যালসেসন রিভার কোমর আঁকড়ে ধরে রেখে ছাড়তে অরাজি। রিভা বলেছে—"ফুটবল ভদ্রলোকের খেলা নয়।"

কিন্তু বল পায়ে নিয়েই রিভার সক্রিয় ভঙ্গির মধ্যে কেউ স্ট্যানলি ম্যাথুজ ও টম ফিনিকে দেখার সাধ মিটিয়েছে। এতেও অনেকে বলেছে, দীর্ঘদেহী, বৃষ-স্কন্ধ বিশিষ্ট রিভা যখন বল নিয়ে বিপক্ষের ফাঁদের মধ্যে ঢোকে—তখন সময় সময় জরজ বেসট, ডিডি ও পেলের গুণপণাও ম্লান হল বলে মনে হয়।

ব্রাজিল-ইংল্যাণ্ডের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপ ম্যাচে বাঁধিয়ে রাখার মত প্রচুর মুহূর্তের সৃষ্টি হয়েছিলো। এতসব কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু সম্পাদন যার জন্যে সম্ভব হয়েছে, তার কথা বলা দরকার। উনি হলেন ইজরায়েলের রেফারি ছত্রিশ বছর বয়সী ক্লিন। ওঁর নিয়োগের প্রসঙ্গে ফিফার রেফারি বোরড যুক্তি দেখিয়েছে ক্লিন ইউরোপ ও আমেরিকার কোন মহাদেশেরই লোক নন বলে—এই কাজ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য, উনি তা ভাল করেছেন।

সালভাদর ও বেসামাল ক্যানডিল

কিন্তু ওই 'ধন্যবাদহীন' কাজটি ঠিকমত না চালাতে পারায় রেফারির সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে সত্তরের ওয়ার্ল্ড কাপে প্রথম গোলমালের সূত্রপাত হয় এল সালভাদর ও মেক্সিকোর খেলাটিতে। রেফারি ছিলেন মিশরের আলি ক্যানডিল।

খেলার সুরুতে সালভাদর মেক্সিকোর আক্রমণ ভালভাবেই ঠেকাচ্ছিল। কিন্তু আলি ক্যানডিলের ভুল সিদ্ধান্তেই এল সালভাদর প্রথম গোল খায়। এতে খেলোয়াড়রা চটে লাল। গোলের পর এমন গোলমাল হয় যে, আলি ছুম করে ঘোষণা করেন—হাফটাইম।

বিরতির শেষে মেক্সিকো মাঠে এলেও সালভাদরের অধিনায়ক ম্যারিওনা মাঠে বেরিয়ে ছুম করে বলটি মেরে দর্শকদের মাঝে পাঠিয়ে

দেয়। পরে ক্যানডিলের দিকে পিছন ফিরে চিৎকার করে বলে —"খেলা শেষ। দরকার হলে তুমি আমার নম্বর নিতে পার। একটা টিমকে কি করে ঠকিয়ে হারাতে হয়, এ তার সাক্ষাৎ নমুনা।"

পরে খেলা হয়েছে এবং ফিফার পর্যবেক্ষক নিকোলাই লাভিচেত খেলা শেষে বলেছেন, "এল সালভাদরের উপর কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হবে, তেমনি রেফারি সম্পর্কেও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

গ্রুপের ওই টুকরো ঘটনাগুলো মালার মত গাঁথলে মন্দ হবে না নিশ্চয়ই। কিন্তু গ্রুপের হারজিতে আটটি টিমের জয় পরাজয় যতটা আগ্রহ নিয়ে দেখা গেছে তার চেয়েও কোয়ার্টার ফাইনালের খেলায় রোমাঞ্চের সৃষ্টি হয়েছিল অনেক বেশি। এই রোমাঞ্চকর কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম বিস্ফরণ ঘটে পঃ জার্মানির হাতে ইংল্যাণ্ডের হঠাৎ পরাজয়ে।

ইংল্যাণ্ডের পরাজয় সম্পর্কে পঃ জার্মানির সংবাদপত্র বিল্ড শাইটুংয়ে বলা হয়েছিল : শক্তিধর ইংল্যাণ্ড টিমের এই পরাজয় অবশ্যই অস্বাভাবিক।

সমালোচনার কাঠগড়ায়—র‍্যামজে

কিন্তু সদা গম্ভীর ইংরাজদের মধ্যে ছুর্মুখেরা খোলাখুলি বলেছে, ইংলিশ ফুটবল পলিশিতে র‍্যামজের একনায়কতন্ত্রই বিপদ ডেকে এনেছে। অথচ সে বলছে, "ভবিষ্যতেও আমি ইংল্যাণ্ড টিমে কেন ম্যানেজার থাকব না তার কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।" আবার অ্যালফকে ম্যানেজারশিপ দিলে উনি শর্ত্ত চাপিয়ে দেবেন, ওঁর কথামত সব কিছু চলবে, কিন্তু এখন সবাই জানে অ্যালফকে বেশি প্রশ্রয় দেওয়ার ফলেই ইংল্যাণ্ডের ভরাডুবি হয়েছে। র‍্যামজের

নীতি ছিল: 'প্লে টু দ্য প্ল্যান অর গেট আউট।' ওই প্ল্যানের জন্যেই কোন খেলোয়াড়ের একক প্রাধান্য ইংল্যাণ্ডের টিমে আমল পায়নি। এতে ইংল্যাণ্ড টিমে খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত চেতনা নষ্ট হয়েছে। সর্বদাই আত্মরক্ষার দেওয়াল শক্ত করতে গিয়ে ইংল্যাণ্ডের আক্রমণ শক্তি ভোঁতা হয়ে গেছে।

র‍্যামজের টেলিভিসন সাক্ষাৎকার, সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ও বেতারে কথা বলাতেও এমন একটা ঘাটতি থেকে গেছে যা ইংল্যাণ্ড টিমের পক্ষে হয়েছে বিশেষ ক্ষতিকর। লিওনে হিল্টন হোটেলে থাকার ব্যবস্থাপনায় র‍্যামজের ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়েছে। ওই হোটেলের দরজায় ইংল্যাণ্ড সমর্থক ও বিরোধীদের উপদ্রবে ইংল্যাণ্ড টিমের শান্তি হয়েছে বিশেষ ভাবে বিঘ্নিত। দেশ থেকে খাবার বয়ে নিয়ে যাওয়ায় র‍্যামজে সকলের উপহাসের পাত্র হয়েছেন এবং বগোটাতে ববি মুরের ঘটনা টিমের একতায় চিড় ধরিয়েছে। এই সব দোষ থেকে মুক্ত হতে প্রথমেই ইংল্যাণ্ড টিমে খেলোয়াড়দের স্বকীয় দক্ষতার উপর জোর দিয়ে ভবিষ্যতের টিম গড়ার প্রয়োজন। আর মেক্সিকোতে টিমের পরাজয় হয়েছে মানেই—একটি ফুটবল যুগের অবসান ঘটল। ইংল্যাণ্ড টিমের বড়াই করার মত যে খেলোয়াড়রা ছিল তাদের অনেকেই আগামী ম্যুনিখের ওয়ার্ল্ড কাপ আসরে যাওয়ার আগেই বড় খেলা থেকে সরে দাঁড়াবে।

র‍্যামজের মতে, প্লেয়াররা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও একবারমাত্র শৈথিল্য দেখানোয় হেরেছে। এজন্য তাদের অভিযুক্ত করা যায় না। প্লেয়াররা দেশে ফিরে বলেছে অ্যালফ কোনমতেই দোষী নয়, আমরাই এই পরাজয়ের কারণ।

যাহোক ওয়েম্বলির বিজয়াস্তে ইংল্যাণ্ডের সাফল্যের চওড়া রাস্তাটি দীর্ঘ চার বছরে ধীরে ধীরে সরু হতে হতে লিওনের মাঠে মিলিয়ে গেছে ১৪ জুন তারিখে।

ইতালির—শনৈঃ গতি

অ্যাজটেক স্টেডিয়ামে কোয়ার্টার ফাইনালের আর এক খেলায় মেক্সিকোর সমর্থকরা ইতালির খেলোয়াড়দের ছুতোনাতায় বিরক্ত করতে কার্পণ্য করেনি। এই উল্টো হাওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে ইতালি মেক্সিকোকে হারিয়েছে ৪—১ গোলে। প্রথমে তারা একটা গোল খেতেই ৩২,০০০ হাজার মেক্সিকো সমর্থকের চিৎকার এক লক্ষের কম্বুকণ্ঠে নিনাদিত হয়েছে। এ সময় হয়তো ইতালি -তে উঃ কোরিয়ার হাতে বিপর্যয়ের ছায়া দেখেছিল।

কিছুক্ষণ বাদে রিভার (দ্য লায়ন) মধ্যে ববি চার্লটন ও জিওফ হার্স্টের সম্মিলিত দক্ষতার প্রকাশ ঘটে। মেক্সিকোর রক্ষণবাহিনীকে থমকে দিয়ে রিভা পর পর দুটি গোল করে টিমের মনোবল ফিরিয়ে এনেছে। ইতালির এই আক্রমণের তোড়ের সামনে মেক্সিকান প্লেয়াররা যেন টাকিলা খেয়ে টলছিল।

ইতালির হাতে এই বেধড়ক মার খেয়ে মেক্সিকোর সমর্থকদের মেক-সিকো-রা-রা শব্দটা আর উচ্চারণ করতে শোনা যায়নি। তবে মনের ক্ষোভ চাপা দিতে ব্রাজিল ও উরুগুয়ের জয়লাভ নিয়ে সেদিনই আনন্দে মেতেছে। ইংল্যাণ্ডের পরাজয়ের খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গে ও'রা জারড মুলারকে গুরু মেনেছে। পরের দিন মেক্সিকোর একটি দৈনিক পত্রে শিরোনাম দেওয়া হয়—"ইঙ্গলেটারা গো হোম।"

রেফারির ভুল সিদ্ধান্তের ফাঁদে রাশিয়া

ওই দিনই এক সন্দেহজনক গোলের শিকার হয়ে রাশিয়ার সম্ভাবনার সূর্য অস্ত গেলেও রাশিয়ার কোচ গ্যাভরিল ক্যাশালিন বলেন,—"যেহেতু আমি টাচ লাইনের ধারে বসেছিলাম সেজন্যে ঠিক ঠাওর করতে পারিনি যে, কুবিলা যখন এসপ্যারাগের কাছে সেনটার করছিল তখন বলটা বাইলাইনের বাইরে ছিল কি না। তাহলেও আমার প্লেয়ারদের স্থির বিশ্বাস বলটা বাইরেই ছিল।"

ফিফা'র পর্যবেক্ষক কেন অ্যাসটন বলেন,—"বলটা যে 'আউট অফ প্লে' হয়েছিলই সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথোপযুক্ত কারণ দেখছি না। অনেক খেলোয়াড় ও কোচ জানেন না সমস্ত বলের পরিধি যতক্ষণ না দাগের বাইরে যাচ্ছে ততক্ষণ বল, 'আউট অব প্লে' ধরা যায় না।"

রাশিয়ার বিরুদ্ধে উরুগুয়ে জিতলেও তাদের সদা ঘর বাঁচাও মনোভঙ্গি তাদেরকে জনপ্রিয় করেনি। এজন্যে ওদের প্রায় খেলাই হয়েছে একঘেঁয়েমিতে ভরা। নেতিবাচক আচরণের জন্যে খেলা শেষে ওদের কোচ এডুয়ার্ডো হোবার্গ বাক্যবাণে জর্জরিত হয়েছেন।

"উরুগুয়ে কেন ফাউল করেছে ?"—একটু তোতলামির ছলে হোবার্গ ওই কথার উত্তর দিয়েছেন—"উরুগুয়েই চারটি টিমের একটি টিম ফেয়ার প্লে ট্রফিতে যাদের বিপক্ষে কোন পেনাল্টি পয়েণ্ট গোনা হয়নি, ব্রাজিলের সঙ্গে পরের খেলায় আহত অভিজ্ঞ অধিনায়ক পেড্রো রোচা সেরে উঠলে আরও ভাল ফলাফল হবে।" উরুগুয়ের দুর্ভাগ্য, তাঁদের ওই দামী খেলোয়াড়টি গ্রুপের প্রথম খেলায় ইজরায়েলের বিরুদ্ধে মাত্র বারো মিনিটের মাথায় আহত হয়ে বেরিয়ে যায়।

সেমিফাইনালের সাক্ষাতকারে মেক্সিকো ও গুয়াদালাজারা, দু'জায়গার দর্শকদেরই পর্যাপ্ত উত্তেজনা জুগিয়েছে। অ্যাজটেক স্টেডিয়ামে নামার আগে ইতালি ও পঃ জার্মানি দুটো টিম সম্বন্ধেই সকলে নিশ্চিত ছিল—দুটি ইউরোপীয়ান টিম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও দঃ আমেরিকার ফুটবলারদের স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী দক্ষতার অভাব ঘটবে না।

ওদিকে গুয়াদালাজারার জালিসকো স্টেডিয়ামের ফলাফল একরকম জানাই ছিল—ব্রাজিল জিতবে। ব্রাজিলের কোচ মারিও জাগালোর মত নিরহঙ্কারী ব্যাক্তিও মতামত রাখেন—"আমরা জুল রিমে কাপ

তৃতীয়বার প্রাপ্তির স্বপ্নের সিঁড়িতে এক ধাপ এগিয়েছি। চিরতরে কাপটি পাওয়ায় এক আলাদা আনন্দ আছে।"

এই শতাব্দীর সেরা ফুটবল হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য ইতালি ও পঃ জার্মানির সেমিফাইনাল ম্যাচটি প্রত্যাশা মত মাঝ মাঠের ঠাসা যুদ্ধে ইতালির ম্যাজোলা, ডি সিস্তি এবং বারতিনিরাও সঙ্গে বেকেনবাওয়ের, ওভারয়্যাথ ও সীলার স্বভাব-সিদ্ধভাবে ঠোকাঠুকি করেছে। তবে এর মধ্যে ইতালিয়ানরা তাদের বল আয়ত্তে রাখার দাপটে গেম একেবারে আস্তে করে দিয়ে কখনো হেঁটেই খেলা চালিয়েছে—মনে হয়েছে ওরা আক্রমণে একান্ত অনিচ্ছুক। জার্মানরা লিওনের পরিবেশকে মানিয়ে মাঠের ধার বরাবর খেলোয়াড় টেনে নিয়ে গিয়ে মাঝখান ফাঁকা করে ডিফেন্সকে দিয়ে হঠাৎ আক্রমণ চালিয়েছে।

ইতালির ক্যাপটেন জিয়াসিনটো ফ্যাচেত্তির আকাঙ্ক্ষা 'আমাদের ১৯৬৬-র ওয়ার্ল্ড কাপের স্মৃতি এক দুঃস্বপ্ন। মেক্সিকোতে চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে ওইটিকে মুছে দিতে আমরা চেষ্টা করব।' ইতালি ফাইনালে যাওয়ায় অনেকেই একটু অবাক হয়েছে। তাদের যুক্তি ইতালি গ্রুপের ম্যাচগুলোতে তো কোনক্রমে লড়েছে। এতেও ওদের কোচ ফেরুসিও ভ্যালকারগি বলেছেন, 'আমার টিমের খেলা দেখে খুশি হয়েছি। পেশায় আমি একজন কোচ, তাই খেলা দেখে দর্শকদের মত আবোল-তাবোল মতামত রাখা আমার সাজে না।'

নিচু মানের গ্রুপ লড়াই

"খেলা শেষে একমাত্র কথাই বাকি থাকে—কে হারল, কে জিতেছে —এবং আমরা জিতেছি এটাই আমাদের মহা সন্তুষ্টি।" মেক্সিকোর গোমড়া মুখো ম্যানেজার কার্ডেনাস ওই মন্তব্যটি রাখেন, বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ওর টিমের ১—০ গোলে বিজয় শেষে। ওই জয়লাভই ওদেরকে আশ্বস্ত করেছে যে আয়োজনকারী দেশ মেক্সিকোও তাহলে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। জয়লাভই যদি খেলার সবকিছু হয় তবে

ধরে নিতে হবে কার্ডেনাসের কথা একটুও মিথ্যা নয়। উল্টো দিকে মেক্সিকোর ওই একটি গোল করার মধ্যে আর্জেন্টিনার রেফারি নরবার্তো কেয়েরজার একটু ভুল করে ফেলেছেন। যে পেনাল্টি থেকে গোলটি হয় তা আদৌ পেনাল্টি দেবার মত ছিল কিনা সেটাই নিরপেক্ষ দর্শকের ঘোরতর সন্দেহ। তবে কার্ডেনাস গ্রুপের কয়েকটি ম্যাচ ছাড়া অন্য খেলাগুলি দেখে খুবই বিরক্তি বোধ করেছেন। তার মতে ওয়ার্ল্ড কাপে এত নিচুমানের খেলা হয়নি। ছোট করে বলতে হলে ওই কার্ডেনাসের কথা আবার আওড়ে বলতে হয়, এক নম্বর গ্রুপে রাশিয়া যে খেলায় বেলজিয়ামকে ৪—১ গোলে হারিয়ে রাজা হতে পেরেছে তাতেও কোন জেল্লা ছিল না।

দু নম্বর গ্রুপ থেকে ইতালি ও উরুগুয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের সিঁড়িতে পৌঁছনোর পথেও তেমন কিছু স্মরণে রাখার মত খেলা ছিল না। তবে তিনের গ্রুপের ২৪ জন ফুটবলারের অনবদ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সহজে ভোলা যাবে না। সেদিক থেকে লিওনের মাঠে 'হিরো' টিম পঃ জার্মানির গোল করার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হলেও একটা কথা ফেলে দেওয়া যায় না পঃ জার্মানি এই গোলগুলি করেছিল কমজোরি ডিফেন্সের বিরুদ্ধে।

ইতালির সামান্য প্রত্যাশায়—বিরাট সাফল্য

ইতালি ও উরুগুয়ের খেলায় একটা কথা বারবার উঁকি দিয়েছে—দুটো টিমই যে করে হোক পরাজয়কে ফাঁকি দিতে চায়। এবিষয়ে ইতালির এক সাংবাদিককে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন—৩২ বছর বাদে আমরা আবার কোয়ার্টার ফাইনাল খেলব এটাই সবচেয়ে বড় কথা। উরুগুয়ের প্লেয়াররা কেন বজ্র আঁটুনির ডিফেন্স নিয়ে খেলেছে, —এ সম্পর্কে উরুগুয়ের কোচ হোবার্গ বলেন, "আমরা যখন মন্টিভিডিও থেকে মেক্সিকোর পথে রওনা দিই তখন একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কি করে

কোয়ার্টার ফাইনাল খেলব। অবশেষে আমরা তা ম্যানেজ করতে পেরেছি।”

হেরে যাওয়ার ভয়ে অনবরত কাঁপুনি ধরার অবস্থা অন্য যে কোন গ্রুপের চেয়ে দুই নম্বর গ্রুপের বেশি দেখা গেছে। পুয়েবলাতে যখন ইতালি ও উরুগুয়ের ম্যাচ ০-০ অবস্থার শেষ হয়েছে তখন খেলা শেষের বাঁশি বাজার পরে সকলেই বলেছে—এই কপাট আঁটা ডিফেন্সিভ খেলায় নেতিবাচক ফুটবলের শেষে প্রসঙ্গটি পর্যন্ত বাদ থাকেনি। ওই ধরনের আত্মরক্ষামূলক হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে ইতালি ও ইজরায়েলের ম্যাচে। এতে ইজরায়েলের খেলোয়াড়েরা বরং খুশি হয়ে বলেছে, খেলাটা খারাপ বলি কি করে? আমাদের ফুটবল ইতিহাসে এটাই হল “গ্রেটেস্ট রেজাল্ট”।

ফুটবলের কমজোরি দেশগুলো যাহোক ওই রকমের খেলায় খানিকটা খুশিই হয়েছে, এটা বলা চলে। ওই ধরনের ‘কিছুতেই হারবনা’ পন্থায় বিশ্বাসী বড় টিমের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে বিপরীতভাবে দুর্বল টিমেরই লাভ হয়েছে বেশি। এল সালভাদরের কোচ হারনান ফ্যারাসকো তার টিম তিনটি ম্যাচের একটিতে গোল করতে না পারায় বিন্দুমাত্র দুঃখিত হয়নি। মরক্কো বুলগেরিয়ার সঙ্গে ১—১ গোলে খেলা ড্র করায় কেউ কেউ মন্তব্য করেছে মরক্কোর এই অভাবিত দক্ষতার জন্য তাদের প্রত্যেক প্লেয়ারকে প্যারিস ঘুরে আসার জন্যে ‘ফ্রি’ পাস দেওয়া উচিত। তবে এই সব কাণ্ডকারখানার মাঝেও সুইডেন ও বেলজিয়ান প্লেয়াররা বরদাস্ত করতে পারেনি। ওরা কেন কোয়ার্টার ফাইনালে যেতে পারল না এটাই ওদের মস্ত দুঃখ।

নবম ওয়ার্ল্ড কাপের সেরা টিম পেরু

সেদিক থেকে পেরু গর্ব করতে পারে, তারা কুলীন ফুটবল দেশ না হয়েও কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছে। লিওনের মাঠে পেরুর

প্লেয়ারদের আক্রমনাত্মক খেলার আগ্রহ ও রক্ষনাত্মক ভঙ্গিতে বিদ্রূপ করার মধ্যে দর্শকরা অত্যধিক আনন্দ পেয়েছেন। স্মৃতির পর্দার তখনি ভেসে উঠেছে কারিস্থিয়ানরাই ছিল পেরুর খেলোয়াড়দের পূর্বসূরী। সব সময়ে শর্ট পাস আক্রমণের বনেদ তৈরি করতে করতে পেরুর খেলোয়াড়দের এগিয়ে যাওয়ার পদ্ধতিকে সকলেই উৎসাহ দিয়েছে। বিরাট বপু গ্যালার্দো এবং তার পাশে স্বাস্থ্যল কুবিল্লাস ও লিওনের শনৈঃ অগ্রগতি আত্মরক্ষার আদর্শকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

তবে বেশিমাত্রায় আক্রমনাত্মক হওয়ায় পেরুর ডিফেন্স ডান-বাম দুধারেই ফাঁক থেকেছে। জারড মুলারের মত বুদ্ধিমান ফরোয়ার্ড সুযোগ গুছোতে একটু সময় নষ্ট করেনি—এর ফলে পঃ জার্মানির কাছে পেরুর হার ঠেকান যায়নি।

সাধারণভাবে দর্শকেরা যখন বেশির ভাগ গ্রুপ ম্যাচগুলোকে উত্তেজনাহীন, একঘেঁয়েমি বিশেষ বলে ওয়ার্ল্ড কাপ অনুষ্ঠান হতে মুখ ফেরাতে চাইলেও কোয়ার্টার ফাইনালে খেলাগুলো তাদের সে হতাশাতে ঝাঁকুনি দিয়েছে।

ইতালি ও পঃ জার্মানি প্রমুখ ইউরোপের দুটো ফুটবল দেশই লাতিন আমেরিকার দর্শকদের বোঝাতে পেরেছে, তাদের মধ্যেও দঃ আমেরিকার ফুটবল দক্ষতার ঘাটতি নেই।

পেরুর বিরুদ্ধে ইতালির কোয়ার্টার ফাইনাল বিজয়ে একটা ভুল ধারণার অবসান হয়েছে ইতালি টিম ১৯৬৬র বিপর্যয়ের মনোভাবকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। পঃ জার্মানি, যাদেরকে ব্রাজিলের পরেই সম্ভাব্য সফল টিম হিসাবে ধরা হয়েছে তারাও ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে জিতে অনেকটা উজ্জীবিত। এই জয়লাভকে তুলনা করা হয়েছে ১৯৫৪-র ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালে শক্তিশালী হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে পঃ জার্মানির জয়ের সঙ্গে।

অনন্য উয়ে সীলার

পঃ জার্মানির ওই সামগ্রিক আক্রমণের মেজাজের মধ্যে সবচেয়ে নজর কেড়েছে উয়ে সীলার। সীলার, ববি চার্লটনের মত নিজেদের ভেঙে পড়া ডিফেন্সকে আগলাতে তরতরিয়ে নিচে নেমে এসেই বল আয়ত্তে পেয়ে আবার উঠেছে আক্রমণ শানাতে। কোয়ার্টার ফাইনালে পেরুর বিরুদ্ধে ম্যাচ শেষে দেখা গেছে ও একটুও ক্লান্ত হয়নি। খেলার সময় সীলার বিরাট জায়গা জুড়ে রাজার দাপটে মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছে। এরই মধ্যে আচমকা একটি বাই সাইক্‌ল কিকে সীলার তার প্রথম দিনগুলির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সীলারের দুর্ভাগ্য ওই শট্‌টি মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্যে গোলে ঢোকেনি। এছাড়া সবসময়েই সীলারকে দেখা গেছে, টিমের অন্য দশটি প্লেয়ার যেন পুতুল দল এবং সীলারের হাতে তাদের পরিচালনার দড়ি।

সেমিফাইনালের ম্যাচের কথা ছেড়ে দিয়েই কে ফাইনালে বিজয়ী হবে বা রেফারিং ঠিক মত হয়েছে কিনা প্রভৃতি নানাবিধ কথাবার্তার ঢেউয়ে আশা করিনি সেমিফাইনালে ইতালি ও পঃ জার্মানির খেলার এত নাটকীয়তা থাকতে পারে। ফুটবল উত্তেজনা কথাটা সময়মত কতটা ভালভাবে খাটতে পারে তা ওদের সেমিফাইনাল মোলাকাতই বলে দিচ্ছে।

শতাব্দীর সেরা সেমিফাইনাল

পুরনো ঘটনার কচকচানি তুলে তুলনা করা যেতে পারে ওই সেমিফাইনালটির সঙ্গে ১৯৫৩ তে ম্যাথুজের খেলা এফ এ কাপ ফাইনাল অথবা ১৯৬০ এ রিয়েল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে এইনট্র্যাখটের ইউরোপীয়ান কাপ ফাইনালের ঘটনা। এই খেলা দেখে দঃ আমেরিকার আধুনিক ফুটবল প্রেমীরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার রেখেছে—সত্যিই, ইউরোপের মধ্যেও আজও ভাল ফুটবল খেলা হয়। এর চেয়েও বড়

কথা খেলার আগেই মেক্সিকোর দর্শকেরা ইতালির টিম মাঠে আসতেই বিদ্রূপ ছুঁড়েছে, কিন্তু খেলা শেষে দুটি টিমই যখন মাঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছিল তখন একটি দর্শকও বসে থাকেনি।

কোথাও হয়তো সামান্য খুঁত থাকলেও উপস্থিত দর্শকেরা ঘন ঘন অবস্থার পরিবর্তনে অভিভূত হয়েছে, ফলে রেফারির হুইশ্‌লে শেষ ফুঁ পরার পরেও ওদেরকে বিস্ময়ে স্তব্ধ থাকতে দেখা যায়।

ট্যাকটিকসের কথায় স্বীকার করতে বাধ্য, পঃ জার্মানি আক্রমণের কাজে নিজেদেরকে প্রথমেই এত নিঃস্ব করে ফেলেছে শেষে ওরা আর ইতালির আক্রমনের কামড় সইতে পারেনি।

ওই ম্যাচটিতে রিভার প্রথম গোলের কার্যকরিতা যখন ইতালির স্বপক্ষে খেলার মীমাংসা করতে চলেছে তখনই ওই সেমিফাইনালের নাট্যে তুমুল আলোড়ন আসে। পঃ জার্মানির মুলার তার অননুকরনীয় ভঙ্গিতে গোলটি করে ফুল টাইমের মধ্যে শুধু খেলার ফলাফল অমীমাংসিত রাখতে সাহায্য করেনি, এমনকি দর্শকদেরও হাজির করেছে অবিস্মরণীয় উত্তেজনাময় ফুটবল মঞ্চের সামনে।

এর'উত্তর দিতে বেশি দেরি হয়নি। ইতালির বনিনসেগনা বাঁ দিক ধরে এত জোরে এগোচ্ছিল, মনে হয়েছে সে সেইমাত্র মঙ্গল গ্রহ থেকে নামল। গেল-গেল রবে জার্মান ডিফেন্স পিছিয়েছে কিন্তু বনির বিপজ্জনক নিচু সেণ্টারটি রিভেরার পায়ের কাছে পৌঁছয়। এর পরে গোলকীপার মেয়ার হিসাবমত ভুল করেছে আর রিভেরার শট্ চলে গেছে সঠিক লক্ষ্যে—আরও আশা জেগেছে বত্রিশ বছর পরে ইতালি ফাইনালে যাবেই।

সেই থেকেই বনিনসেগনার দ্রুত জায়গা পরিবর্তন ও লক্ষ্য পথ বদলান জার্মানির প্লেয়ারদের কাছে হয়েছে বিদ্রুপ সরূপ। এতে সবচেয়ে অসহায় দেখা গেছে একত্রিশ বছর বয়সী জার্মানির স্কুলৎসকে। ওকে হজেশের পরিবর্তে নামানো হলেও একটা ‘কিন্তু’ থেকে গেছে—

গুর বদলে পঁচিশ বছর বেসী মিশেলকে নামালে কেমন হত ? এই প্রশ্নটাই শেষে পঃ জার্মানির শ্যোনকে শেল বিঁধিয়েছে।

শ্যোনের চালে ভুল

তখন হয়তো শ্যোন দ্বিতীয় চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। এমন সময় আবার আঘাত। অতিরিক্ত সময়ের নবম মিনিটে স্লুলৎসের হতচকিত অবস্থার সুযোগে বনি ইতালিকে এগিয়ে দিয়েছে। তখন হয়তো শ্যোন ভাবছিলেন—আমাদের ডিফেন্সে একটু গড়বড় হয়ে গেছে।

শ্যোনের এই ভুলের বিপরীত পট ছিল স্বাভাবিকভাবেই ভিন্ন বোধে চিত্রিত। ইতালির কোচ ফেরুসিও ভ্যালক্যারেগি (৫০ বছর বয়সী) ঠিক করেছিল প্রথমার্ধে ম্যাজোলাকে মিডফিল্ডে খেলানোই ভাল হবে। দ্বিতীয়ার্ধে ওই জায়গায় খেলবে রিভেরা। বাস্তবে ওর দূরদর্শিতা কাজে লেগেছে।

পাশাপাশি আর একটি চিত্র মনে পড়ে ১৯৬৬ সালের। সেদিন অখ্যাতনাম উঃ কোরিয়ার কাছে ইতালির হারায় ওদের ভ্যালক্যারেগির পূর্বসূরী কোচ এডমণ্ডো ফ্যাবরিকে (ডাক নাম টোপোলিনো) ইতালির সাংবাদিকরা তাড়া করে ছিল। সেই সাংবাদিকদের ক্ষুরধার প্রশ্নের সামনে পড়ে তিনি ভয়কাতর হয়ে বলেছিলেন—ইতালি আমার জন্যেই হেরেছে। ওই টিমটি জেনোয়া বিমান বন্দরে পৌছলে ইতালিয়ান সমর্থকরা টমাটো ছুঁড়ে সংবর্ধনা জানিয়েছে। তখন ওদের অবস্থাটা ?

পঃ জার্মানির সেমিফাইনাল বিপর্যয় নিয়ে চিন্তার ঢেউ উঠেছে —উয়েসীলার ও সেনেলিঞ্জার দিন শেষ হয়ে এসেছে। বেকেনবাওয়ের ওভারাথ, ভগটস, ফিশেল, জার্ড মুলার, গ্রাবোস্কির আগমন ১৯৭৪ এ পঃ জার্মানিকে হয়তো ওয়ার্ল্ড কাপ বিজয়ে সাহায্য করবে। এর পরেই আর একটা খাপছাড়া সন্দেহ এগিয়ে এসেছে—ইংল্যাণ্ড যদি পঃ জার্মানদের হারাতো তবে তারা ইতালির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতো কি ?

যাহোক ফাইনাল খেলার অগে আরো কতকগুলি কথা প্রাক ফাইনাল পরিবেশকে সজীবতা দিয়েছে। জুল রিমের ট্রফির নিশ্চিত বিদায় জেনে ফিফা'র পুরনো পাতা ঘেঁটে জিগির তোলা হয়েছে—১৯৪৬ এ ফিফা'র সভায় বলা হয়েছিল, সভাপতি জুল রিমের নামটি চিরস্মরণীয় রাখতেই হবে। দর্শকরা ফাইনাল খেলার সময় ইতালির হঠাৎ জেগে ওঠা স্ট্যামিনার সঙ্গে ব্রাজিলের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট বিদ্ধৃত ফুটবলারদের জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা আশা করেছে। আবার ১৬টি টিমের ফাইনাল পর্যায়ের খেলার এটাই ছিল শেষ অঙ্ক—কারণ এর আগেই ফিফা ঠিক করে ফেলেছে—১৯৭৪ তে ম্যুনিখের ওয়ার্ল্ড কাপে ২৪ টি দল ফাইনাল পর্বে খেলবে।

ফাইনালের আগে জমাট পরিবেশ কি হতে পাবে বা কি পারে না এ নিয়ে আলোচনার অন্ত ছিল না।

সকলেরই মুখে এক কথা ছিল ফাইনালটা হবে একটা সর্বোত্তম আত্মরক্ষার আদর্শে বিশ্বাসী টিমের বিরুদ্ধে সদা আক্রমনাত্মক লড়িয়ে টিমের ফুটবল যুদ্ধ। যা একটা দেখার মত ম্যাচ। এর আগের কয়েক বছরের মধ্যে ইতালি বা ব্রাজিল কেউই তাদের ফুটবল রীতিতে কোন তোলপাড় করা পরিবর্তন আনেননি। ইতালির সমস্ত নজর অপর দিকের ফরোয়ার্ড বাহিনীর উপবে—এবং ব্রাজিলের চেষ্টা কিভাবে ওই কড়া নজর এড়িয়ে গোল করে আসা সম্ভব হবে।

হট ফেভারিট—ব্রাজিল

ব্রাজিলকে ফেভারিট বলেই ধরা হয়েছে। ফাইনালের আগে পাঁচটি ম্যাচে তারা পনেরোটি গোল করলেও ওদের অধিনায়ক কর্লোস আলবার্তো ও সর্বকালের সেরা সেণ্টার ফরোয়ার্ড পেলে বলেছে—ব্রাজিল তার কঠিনতম ম্যাচটি খেলেছিল ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে।

ব্রাজিলের ওই গোল-পাগল ফরোয়ার্ডদের কি করে রোখা যায় এটাই একমাত্র সমস্যা হিসাবে ইতালির গোলকীপার অ্যালবার্তোসি মেনে নিয়েছে—যদিও সে ফাইনালের আগে সারা টুর্নামেণ্টে মাত্র চারটে গোল খেয়েছিল, বলাবাহুল্য ওর মধ্যে তিনটি পঃ জার্মানির বিরুদ্ধে। ওই গোলকীপারটি পাহারা দেবার ভার ফ্যাচেত্তি ও বার্গনিচের উপর পড়েছিল—যাদের খেলার তুলনা করা সব সময় সম্ভব নয়।

ব্রাজিলের যত মুস্কিল ওই গোলকীপার ফেলিক্সকে কেন্দ্র করেই। কার্লোস অ্যালবার্তো, ব্রিটো, পিজা ও এভারেল্ডোর মত জবর ডিফেণ্ডার খুঁটিদের পিছনে থেকেও ফেলিক্স কখন কি ফস্‌কে ফেলে—সেটাই বলা দুরূহ। এই সুযোগে ইতালির রিভা, ডোমেঙ্ঘিনি ও মাজোলা প্রমুখেরা ওকে বিপদে ফেলবেই এই ছিল ধারণা।

যদিও ব্রাজিল অ্যাজটেকে সেই সর্বপ্রথম খেলতে নামছিল তবু তারা দেহে ও মনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে এই কথাটা ব্রাজিলের কোচ জাগালো জানিয়ে দেন। ইতালির কি হবে এর উত্তরে ওদের কোচ ভ্যালকারেগি জোরের সঙ্গে বলেন, পঃ জার্মানির সঙ্গে জিতে আমরা যেমন অভিনন্দন পেয়েছিলাম রবিবার ফাইনাল খেলার পরেও ওই ধরণের অভিনন্দন কুড়োবার জন্যে পরে সারারাত জেগে কাটানোয় সে রাজি।

ফুটবল বিশ্বের বেশির ভাগ লোক যা ভেবেছিল ২১ জুন মেক্সিকো সিটির অ্যাজটেক স্টেডিয়ামে সেই ফলাফলেই ব্রাজিল—ইতালির ফাইনাল খেলা শেষ হয়েছে—ব্রাজিল দিয়েছে চারটি গোল, ইতালি তার জবাবে দিতে পেরেছে মাত্র একটি।

চারটি গোল—ইশারা, ঝলকানি বুদ্ধিমত্তা—অব্যর্থতা

সামান্য একটা ইশারা, একটা ঝলকানি, বুদ্ধিমত্তা ও সর্বশেষে নিখুঁত লক্ষ্যভেদই ব্রাজিলের চারটি গোলের চার রকমের সক্ষিপ্ত বর্ণনা। বিশ্বের এই সর্বাধুনিক আক্রমণাত্মক ফুটবল শক্তির বিরুদ্ধে ইতালি আত্মরক্ষার সবিশেষ পণ্ডিত হয়েও দাঁড়াতে পারেনি।

এর ফলে জুল রিমে ট্রফি রায়ো-ডি-জেনেরোতে যেমন চিরতরে চলে গেছে তার সঙ্গে কোটি কোটি ফুটবল প্রেমীর শুভেচ্ছাও বাদ থাকেনি। প্রতিটি ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল পর্বে ব্রাজিলের উপস্থিতিতে যেমন আসর সরগরম হয়ে উঠেছে এবারেও তাদের আরো একটি নব সংযোজন—ফুটবল খেলা যখন কপাট আঁটা রক্ষনাত্মক পর্যায়ে নেমে যাচ্ছিল ব্রাজিলের প্লেয়াররা তার বদলে প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক ফুটবলের পরিচয়ে ফুটবল জগতে আলোড়ন এনেছে।

ব্রাজিল টিমের সমর্থক ঠাসা অ্যাজটেকে কখনো দেখা গেছে যে ব্রাজিল টিম যেন পিছিয়ে আসতে ব্যস্ত—কিন্তু পরক্ষণেই সে ধারণার ভুল ভেঙে তারা তেড়ে ফুঁড়ে ইতালির রক্ষণ ব্যূহে ঢুকে পড়েছে। এটাই হল ব্রাজিলের নতুন মোহবিস্তার পরিকল্পনার একটি দিক। এই রকম ওঠা নামার মুহূর্তের মাঝখানেই ব্রাজিল প্রথম তুটো গোল করেছে। ওই মাত্র দশ মিনিট জুল রিমে কাপ হার জিতের ফয়সালা চূড়ান্তভাবে নির্নীত হয়েছে—প্রত্যেক ম্যাচেই যেমন মোড় ঘোরার সময় আসে সেদিক থেকে ওই সময়টুকুও ব্রাজিল দিতে রাজি হয়নি। তারা একটা জিনিস জলের মত সহজ করে প্রতিপক্ষ ও উপস্থিত দর্শকদের বুঝিয়েছে—ব্রাজিল যখন তুঙ্গে খেলে তখন তাদের টেনে নামানোর মত কোন ফুটবল শক্তি পৃথিবীতে নেই। শেষ কুড়ি মিনিট ওরা ইতালির প্লেয়ারদের নিয়ে ছেলে খেলা করছে ও তাদের সংহতি ধ্বংস করতে একটু পিছপা হয়নি।

ইতালীয়রা তাদের দক্ষতার অংশ হিসাবে রিভা, ডোমেঙ্ঘিনি ও মাজোলাকে দিয়ে মোহময় মুহূর্ত সৃষ্টি করলেও ব্রাজিলের ডিফেন্সকে বহুক্ষণ ধরে বিপাকে ফেলে শাস্তি দেওয়ায় ওরা সক্ষম হয়নি। পেলে, তোস্তাও ও জেয়ার জিনহো আড়াল করা চেষ্টা চলতেই হঠাৎ দেখা গেছে রিভেলিনো, ক্লডোয়াল্ডো চেগে উঠেছে।

ইতালির এই ব্যর্থতার মিছিলের জন্য দায়ী হয়তো তাদের খেলা

অসামান্য সেমিফাইনাল ম্যাচটি। সেখানেই তারা সমূহ শক্তি পঃ জার্মানির পায়ে ঢেলে দিয়ে ফতুর হয়েছে।

ওই ফাইনালে ছোট খাটো ঘটনার মধ্যে পঃ জার্মানির রেফারি রুডি গ্লকনার একবার জড়িয়ে পড়েছেন। তখন হাফ টাইম হতে চলেছে। তোস্তাওয়ের পাশ পেয়ে পেলে বলটি ইতালির গোলে মেরেছে। রেফারি জানান, ঠিক তার আগেই উনি বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে হাফ-টাইম ঘোষণা করতে সুরু করেছিলেন তাই পেলের গোলটি দেওয়া যায় না। এতে দর্শকরা চিৎকারে ফেটে পড়ে। একে গোলের ব্যাপার তাও আবার পেলের পা থেকে হয়েছে!

উপযুক্ত সময়ে—উত্তম ফেলিক্স

ব্রাজিলের গোলকীপার ফেলিক্সের সম্বন্ধে দুর্বল ধাবণা রাখা হলেও সে তার প্রতিবাদ করতে খেলা সুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই রিভার একটি সট নিজের শরীর ধনুকের মত বাঁকিয়ে ক্রশ বারের উপর দিয়ে ফিস্ট করে দিয়ে।

অতঃপর ফাইনালের দৃশ্যপটে চোখে পড়েছে ইতালির রোসাটো ব্রাজিলের তোস্তাও ও পেলেকে নজর বন্দী রাখতে যেমন যত্নবান হচ্ছে অপরদিকে ব্রাজিলের অধিনায়ক আলবার্তো তার অন্যান্য সহযোগী জেয়ারজিনহো ও রিভেলিনোকে দিয়ে ব্রাজিলের রক্ষণভাগের উপর আক্রমণের চাপ ছড়াচ্ছেন। এই কাজে ইতালির অধিনায়ক ফ্যাচেত্তির দৃঢ় প্রতিরোধও ব্রাজিল পুরোভাগকে ঠাণ্ডা করতে পারেনি। ক্ষণিকের জন্যে বার্গনিচ, সেরা, রোসাটোকে নিয়ে ফ্যাচেত্তি প্রতিরোধের পাঁচিল তুলবে কিনা ঠিক করতে পারছিল না। এই ফাঁকে ব্রাজিল ডিফেন্সের তৃতীয় সংযোগ সড়কটিও তৈরি হয়ে যায়। এর নায়ক গার্সন। রক্ষণভাগের স্তম্ভ. গার্সন যে ওই পরিকল্পনায় সফল চরিত্র তার প্রমাণ সে চকিতে একটি গোল করে জানিয়ে দিয়েছে। গার্সনের আবির্ভাবে ব্রাজিল টিমের বনিয়াদ যে দৃঢ় হয়েছে তাতে আর সন্দেহ থাকেনি।

মোট কথা ব্রাজিলের ৪-১ গোলে জয়লাভ একটা সত্যি যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করল—দঃ আমেরিকার ফুটবল আধিপত্য অস্বীকার করার মত হিম্মৎ ইউরোপের কোন টিমেরই নেই।

আদর্শ ওয়ার্ল্ড কাপ

খেলা শেষে দর্শকদের চাউনির সিংহভাগ পড়ল পেলের গতিবিধির উপর। এর কিছুক্ষণ আগে পেলে তার শেষ ওয়ার্ল্ড কাপ অভিযানে মূর্ত হয়েছিল নায়কের ভূমিকায়। ১৯৫৮তে পেলে তার প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার সময় বিশ্বের ফুটবল রঙ্গভূমিতে নিতান্ত সাধারণ বেশে নিঃশব্দে নেমেও, এনেছিল এক প্রচণ্ড আলোড়ন। বিদায়ের শেষ বেলায় পেলে নিজের খেলোয়াড়ী জীবনের মধ্যে দিয়ে আধুনিক ফুটবলারদের জন্য রেখে গেছে একটি অমূল্য উপদেশ: একটি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ফুটবলার কি ভাবে সংযমের আদর্শ আঁকড়ে বিশ্বের কঠিনতম ফুটবল যুদ্ধেও একা লড়ে যেতে পারে তার উদাহরণ। পেলের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাই একটা যুগও চোখের সামনে থেকে সরে গেছে।

পেলে তার প্রস্থান প্রসঙ্গ নিয়ে নিশ্চয়ই বিলাপ করেনি। ১৯৭০-এর ওয়ার্ল্ড কাপ অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু সম্পাদন নিশ্চয়ই তার মনের কথাগুলি প্রতিফলিত করতে পেরেছে।

ঘটনাময় সত্তরের ওয়ার্ল্ড কাপ আগাগোড়া ওইসব প্রচণ্ড নাটকীয়তার জন্যে যেমন স্মরণে থাকবে অনুরূপভাবে এর আরও পরিচয় থাকবে: "ভদ্র ফুটবলারদের ওয়ার্ল্ড কাপ নামে।" প্রায় প্রত্যেকটি রেফারি দৃঢ়তা ও নিরপেক্ষতায় খেলা পরিচালনা করেছেন। সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছিল বেলজিয়াম ও মেক্সিকোর ম্যাচে। সমস্ত গ্রুপ ম্যাচে মাত্র ৩০ বার খেলোয়াড়দের সাবধান করা হয়েছে, কিন্তু কাউকে বার করে দেওয়া হয়নি। বেলজিয়ামের জিন ঝিসেনকে (মেক্সিকোর বিরুদ্ধে) সতর্কীকরণের জন্য রেফারি তিনবার হলদে

কার্ড দেখিয়েও মাঠ থেকে বার করেননি। সুইডেন-উরুগুয়ের খেলার আগে গুজব রটে ব্রাজিলের রেফারি অ্যাভিটে মোরে নাকি ঘুষ খেয়েছেন। এই শুনে স্ট্যানলি রাউস ও কেন অ্যাসটন ম্যাচ পরিচালনার ভার অন্যের হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

মেক্সিকোর পাট চুকিয়ে ম্যুনিখের (১৯৭৪) ওয়ার্ল্ড কাপ অনুষ্ঠানের দিকে তাকিয়ে আরও ভাবতে হয়েছে চল্লিশ বছরের পুরনো কাঞ্চন-পরী জুল রিমের চিরপ্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের ফুটবল রঙ্গমঞ্চ থেকে কতকগুলো মুখ ক্রমশঃ আবছা হয়ে এসেছে। রাশিয়ার লেভ ইয়াসিন সত্তরেও রুশ দলে ছিলেন, ম্যুনিখে ওঁর বয়স হবে চুয়াল্লিশ। ইংল্যাণ্ডের গরডন ব্যাঙ্কসের নামটাও ইংল্যাণ্ড দলের তালিকায় প্রথম নাম হিসাবে আর হয়তো দেখা যাবে না। ওই একই পথ অনুসরণ করবেন ববি চার্লটন। পঃ জার্মানির উয়ে সীলার ম্যুনিখের ঘরের মাঠে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে নামবেন না হয়তো। ওই প্রস্থানের মিছিলে ফুটবলের রাজা 'পেলে' সর্বাগ্রে বিদায় পতাকা বহন করবেন।

মেক্সিকো

গ্রুপ ১

সুইজারল্যাণ্ড ১ গ্রীস ০ ; রুমানিয়া ২ সুইজারল্যাণ্ড ০ ;
সুইজারল্যাণ্ড ২ পর্তুগাল ০ ; রুমানিয়া ১ সুইজারল্যাণ্ড ০ ;
গ্রীস ৪ সুইজারল্যাণ্ড ১ ; সুইজারল্যাণ্ড ১ পর্তুগাল ১ ;
গ্রীস ২ রুমানিয়া ২ ; গ্রীস ৪ পর্তুগাল ২ ;
পর্তুগাল ২ গ্রীস ২ ; রুমানিয়া ১ পর্তুগাল ০ ;
পর্তুগাল ৩ রুমানিয়া ০ ; রুমানিয়া ১ গ্রীস ১ ;

কে? কোথায়?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
রুমানিয়া	৬	৩	২	১	৭	৬	৮
গ্রীস	৬	২	৩	১	১৩	৯	৭
সুইজারল্যাণ্ড	৬	২	১	৩	৫	৮	৫
পর্তুগাল	৬	১	২	৩	৮	১০	৪

রুমানিয়া বিজয়ী হয়েছে।

গ্রুপ ২

হাঙ্গেরি ২ চেকশ্লোভাকিয়া ০ ; চেকশ্লোভাকিয়া ৩ হাঙ্গেরি ৩ ;
হাঙ্গেরি ২ আয়ার্ল্যাণ্ড ১ ; হাঙ্গেরি ৩ ডেনমার্ক ০ ;
ডেনমার্ক ৩ হাঙ্গেরি ২ ; চেকশ্লোভাকিয়া ৩ আয়ার্ল্যাণ্ড ০ ;
চেকশ্লোভাকিয়া ২ অয়ার্ল্যাণ্ড ১ ; চেকশ্লোভাকিয়া ১ ডেনমার্ক ০ ;
চেকশ্লোভাকিয়া ৩ ডেনমার্ক ০ ; আয়ার্ল্যাণ্ড ১ ডেনমার্ক ১ ;
ডেনমার্ক ২ আয়ার্ল্যাণ্ড ০ ; হাঙ্গেরি ৪ আয়ার্ল্যাণ্ড ০ ;

কে? কোথায়?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
হাঙ্গেরি	৬	৪	১	১	১৬	৭	৯
চেকশ্লোভাকিয়া	৬	৪	১	১	১২	৬	৯
ডেনমার্ক	৬	২	১	৩	৬	১০	৫
আয়ার্ল্যাণ্ড	৬	০	১	৫	৪	১৩	১

প্লে-অফ খেলা (মার্সাইতে): চেকশ্লোভাকিয়া ৪ হাঙ্গেরি ১, চেকশ্লোভাকিয়া বিজয়ী হয়েছে।

গ্রুপ ৩

পূর্ব জার্মানি ২ ইতালি ২; ইতালি ৪ ওয়েলস ১;
ইতালি ১ ওয়েলস ০; পূর্ব জার্মানি ২ ওয়েলস ১;
পূর্ব জার্মানি ৩ ওয়েলস ১; ইতালি ৩ পূর্ব জার্মানি ০;

কে? কোথায়?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
ইতালি	৪	৩	১	০	১০	৩	৭
পূর্ব জার্মানি	৪	২	১	১	৭	৪	৫
ওয়েলস	৪	০	০	৪	৩	১০	০

ইতালি বিজয়ী হয়েছে।

গ্রুপ ৪

রাশিয়া ২ উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড ০;
উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড ০ রাশিয়া ০;
উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড ৪ তুরস্ক ১;
রাশিয়া ৩ তুরস্ক ০;
উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড ৩ তুরস্ক ০;
রাশিয়া ৩ তুরস্ক ১;

কে? কোথায়?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
রাশিয়া	৪	৩	৩	০	৮	১	৭
উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড	৪	২	১	১	৭	৪	৫
তুরস্ক	৪	০	০	৪	২	১৩	

রাশিয়া বিজয়ী হয়েছে।

গ্রুপ ৫

ফ্রান্স ৩ সুইডেন ০; সুইডেন ২ ফ্রান্স ০; নরওয়ে ১ ফ্রান্স ০; ফ্রান্স ৩ নরওয়ে ১; সুইডেন ৫ নরওয়ে ০; সুইডেন ৫ নরওয়ে ২;

কে? কোথায়?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
সুইডেন	৪	৩	০	১	১২	৫	৬
ফ্রান্স	৪	২	০	২	৬	৪	৪
নরওয়ে	৪	১	০	৩	৪	১৩	২

সুইডেন বিজয়ী হয়েছে।

গ্রুপ ৬

স্পেন ২ যুগোশ্লাভিয়া ১; যুগোশ্লাভিয়া ০ স্পেন ০;
স্পেন ১ বেলজিয়াম ১; বেলজিয়াম ২ স্পেন ১;
স্পেন ৬ ফিনল্যাণ্ড ০; ফিনল্যাণ্ড ২ স্পেন ০;
যুগোশ্লাভিয়া ৪ বেলজিয়াম ০; বেলজিয়াম ৩ যুগোশ্লাভিয়া ০;
যুগোশ্লাভিয়া ৯ ফিনল্যাণ্ড ১; যুগোশ্লাভিয়া ৫ ফিনল্যাণ্ড ১;
বেলজিয়াম ৬ ফিনল্যাণ্ড ১; বেলজিয়াম ২ ফিনল্যাণ্ড ১;

কে? কোথায়?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
বেলজিয়াম	৬	৪	১	১	১৪	৮	৯
যুগোশ্লাভিয়া	৬	৩	১	২	১৯	৭	৭
স্পেন	৬	২	২	২	১০	৬	৬
ফিনল্যাণ্ড	৬	১	০	৫	৬	২৮	২

বেলজিয়াম বিজয়ী হয়েছে।

গ্রুপ ৭

পশ্চিম জার্মানি ৩ স্কটল্যাণ্ড ২ ; স্কটল্যাণ্ড ১ পশ্চিম জার্মানি ১ ;
পশ্চিম জার্মানি ১ অষ্ট্রিয়া ০ ; পশ্চিম জার্মানি ২ অষ্ট্রিয়া ০ ;
পশ্চিম জার্মানি ১২ সাইপ্রাস ০ ; পশ্চিম জার্মানি ১ সাইপ্রাস ০ ;
স্কটল্যাণ্ড ২ অষ্ট্রিয়া ১ ; অষ্ট্রিয়া ২ স্কটল্যাণ্ড ০ ;
স্কটল্যাণ্ড ৮ সাইপ্রাস ০ ; স্কটল্যাণ্ড ৫ সাইপ্রাস ০ ;
অষ্ট্রিয়া ৭ সাইপ্রাস ১ ; অষ্ট্রিয়া ২ সাইপ্রাস ১ ;

কে ? কোথায় ?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
পশ্চিম জার্মানি	৬	৫	১	০	২০	৩	১১
স্কটল্যাণ্ড	৬	৩	১	২	১৮	৭	৭
অষ্ট্রিয়া	৬	৩	০	৩	১২	৭	৬
সাইপ্রাস	৬	০	০	৬	২	৩৫	০

পশ্চিম জার্মানি বিজয়ী হয়েছে।

গ্রুপ ৮

নেদারল্যাণ্ড ২ লাক্সেমবার্গ ০ ; নেদারল্যাণ্ড ৪ লাক্সেমবার্গ ০ ;
বুলগেরিয়া ২ লাক্সেমবার্গ ১ ; পোল্যাণ্ড ৮ লাক্সেমবার্গ ১ ;
পোল্যাণ্ড ৫ লাক্সেমবার্গ ১ ; নেদারল্যাণ্ড ১ বুলগেরিয়া ১ ;
বুলগেরিয়া ২ নেদারলাণ্ড ০ ; বুলগেরিয়া ৪ পোল্যাণ্ড ১ ;
নেদাবল্যাণ্ড ১ পোল্যাণ্ড ০ ; পোল্যাণ্ড ২ নেদারল্যাণ্ড ১ ;
পোল্যাণ্ড ৩ বুলগেরিয়া ০ ; বুলগেরিয়া ৩ লাক্সেমবার্গ ১ ;

কে ? কোথায় ?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
বুলগেরিয়া	৬	৪	১	১	১২	৭	৯
পোল্যাণ্ড	৬	৪	০	২	১৯	৮	৮
নেদাবল্যাণ্ড	৬	৩	১	২	৯	৫	৭
লাক্সেমবার্গ	৬	০	০	৬	৬	২৪	০

বুলগেরিয়া বিজয়ী হয়েছে।

গ্রুপ ৯

১৯৬৬র বিজেতা ইংল্যাণ্ড মূল ফাইনালে খেলেছে।

গ্রুপ ১০

পেরু	২	আর্জেন্টিনা	২;	পেরু	১	আর্জেন্টিনা	০;
আর্জেন্টিনা	১	বলিভিয়া	০;	বলিভিয়া	৩	আর্জেন্টিনা	১;
পেরু	৩	বলিভিয়া	১;	বলিভিয়া	২	পেরু	১;

কে? কোথায়?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
পেরু	৪	২	১	১	৭	৫	৫
বলিভিয়া	৪	২	০	২	৬	৬	৪
আর্জেন্টিনা	৪	১	১	২	৪	৬	৩

পেরু বিজয়ী হয়েছে।

গ্রুপ ১১

ব্রাজিল	৬	ভেনেজুয়েলা	০;	ব্রাজিল	৫	ভেনেজুয়েলা	০;
ব্রাজিল	৬	কলম্বিয়া	২;	ব্রাজিল	২	কলম্বিয়া	০;
ব্রাজিল	১	প্যারাগুয়ে	০;	ব্রাজিল	৩	প্যারাগুয়ে	০;
ভেনেজুয়েলা	১	কলম্বিয়া	১;	কলম্বিয়া	৩	ভেনেজুয়েলা	০;
প্যারাগুয়ে	২	ভেনেজুয়েলা	০;	প্যারাগুয়ে	১	ভেনেজুয়েলা	০;
প্যারাগুয়ে	২	কলম্বিয়া	০;	প্যারাগুয়ে	১	কলম্বিয়া	১;

কে? কোথায়?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
ব্রাজিল	৬	৬	০	০	২৩	২	১২
প্যারাগুয়ে	৬	৪	০	২	৬	৫	৮
কলম্বিয়া	৬	১	১	৪	৭	১২	৩
ভেনেজুয়েলা	৬	০	১	৫	১	১৮	১

ব্রাজিল বিজয়ী হয়েছে।

গ্রুপ ১২

উরুগুয়ে ২ চিলি ০; চিলি ০ উরুগুয়ে ০;
উরুগুয়ে ১ ইকুয়েডর ০; উরুগুয়ে ২ ইকুয়েডর ০;
চিলি ৪ ইকুয়েডর ১; ইকুয়েডর ১ চিলি ১;

কে? কোথায়?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
উরুগুয়ে	৪	৩	১	০	৫	০	৭
চিলি	৪	১	২	১	৫	৪	৪
ইকুয়েডর	৪	০	১	৩	২	৮	১

উরুগুয়ে বিজয়ী হয়েছে।

গ্রুপ ১৩

সাব-গ্রুপ ১: কস্টারিকা ১; হণ্ডুরাস ১: কস্টারিকা ০; কস্টারিকা ৩ জামাইকা ০; কস্টারিকা ৩ জামাইকা ১; হণ্ডুরাস ৩ জামাইকা ১; হণ্ডুরাস ২ জামাইকা ০;

কে? কোথায়?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
হণ্ডুরাস	৪	৩	১	০	৭	২	৭
কস্টারিকা	৪	২	১	১	৭	৩	৫
জামাইকা	৪	০	০	৪	২	১১	০

সাব-গ্রুপ ২: এল সালভাদর ৬ সুরিনেম ০; সুরিনেম ৪ এল সালভাদর ১; এল সালভাদর ১ নেদারল্যাণ্ড অ্যান্টিলেস ০; এল সালভাদর ২ নেদারল্যাণ্ড আন্টিলেস ১; সুরিনেম ৬ এল সালভাদর ২; নেদারল্যাণ্ড অ্যান্টিলেস ২ সুরিনেম ০।

কে? কোথায়?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
এল সালভাদর	৪	৩	০	১	১০	৫	৬
সুরিনেম	৪	২	০	২	১০	৯	৪
নেঃ অ্যান্টিলেস	৪	১	০	৩	৩	৯	২

সাব-গ্রুপ ৩ ঃ গুয়াতেমালা ৪ ত্রিনিদাদ ০ ; ত্রিনিদাদ ০ গুয়াতেমালা ০ ; গুয়াতেমালা ১ হাইতি ১ ; হাইতি ২ গুয়াতেমালা ০ ; হাইতি ৪ ত্রিনিদাদ ০ ; ত্রিনিদাদ ৪ হাইতি ২ ;

কে ? কোথায় ?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
হাইতি	৪	২	১	১	৯	৫	৫
গুয়াতেমালা	৪	১	২	১	৫	২	৪
ত্রিনিদাদ	৪	১	১	২	২	১২	৩

সাব-গ্রুপ ৪ ঃ যুক্তরাষ্ট্র ৬ বার্মুডা ২ ; যুক্তরাষ্ট্র ২ বার্মুডা ০ : যুক্তরাষ্ট্র ১ কানাডা ০ ; কানাডা ৪ যুক্তরাষ্ট্র ২ ; কানাডা ৪ বার্মুডা ০ ; বার্মুডা ০ কানাডা ০ ।

কে ? কোথায় ?

	খেলা	জ	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
যুক্তরাষ্ট্র	৪	৩	০	১	১১	৬	৬
কানাডা	৪	২	১	১	৮	৩	৫
বার্মুডা	৪	০	১	৩	২	২	১

সাব-গ্রুপের নিষ্পত্তি মূলক ম্যাচ ঃ—হণ্ডুরাস ১ এল সালভাদর ০ ; এল সালভাদর ৩ হণ্ডুরাস ০ ; এল সালভাদর ৩ হণ্ডুরাস ২ (অতিরিক্ত সময়ে) ; হাইতি ২ যুক্তরাষ্ট্র ০ ; যুক্তরাষ্ট্র ১ হাইতি ০ ; হাইতি ৩ এল সালভাদর ০ ; এল সালভাদর ২ হাইতি ১ ; এল সালভাদর ১ হাইতি ০ ; অতিরিক্ত সময়ে এল সালভাদর বিজয়ী হয়েছে ।

গ্রুপ ১৪ ঃ আয়োজনকারী দেশ হিসাবে মেক্সিকোকে বিজয়ী ধরা হয়েছে ।

সাব-গ্রুপ ১৫ঃ সিওলে সাব গ্রুপ টুর্নামেন্ট ঃ—অস্ট্রেলিয়া ৩ জাপান ১ ; দঃ কোরিয়া ২ জাপান ২ ; অস্ট্রেলিয়া ২ দঃ কোরিয়া ১ ; অস্ট্রেলিয়া ১ জাপান ১ ; দঃ কোরিয়া ২ জাপান ০ ; দঃ কোরিয়া ১ অস্ট্রেলিয়া ১।

কে ? কোথায় ?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
অস্ট্রেলিয়া	৪	২	২	০	৭	৪	৬
দঃ কোরিয়া	৪	১	২	১	৬	৫	৪
জাপান	৪	০	২	২	৪	৮	২

সাব গ্রুপ (ইজরায়েলে ২টি খেলা হয়েছে) উঃ কোরিয়া নাম প্রত্যাহার করে নেয়। ইজরাইল ৪ নিউজিল্যাণ্ড • ; ইজরাইল ২ নিউজিল্যাণ্ড ০।

লরেন্সো মার্কুইজে দ্বিতীয় দফায় ঃ অস্ট্রেলিয়া ০ রোডেসিয়া ০ ; অস্ট্রেলিয়া ৩ রোডেসিয়া ১ ; প্লে-অফ ঃ ইজরায়েল ১ অস্ট্রেলিয়া ০ ; অস্ট্রেলিয়া ১ ইজরায়েল ১।

ইজরায়েল বিজয়ী সাব্যস্ত হয়েছে।

গ্রুপ ১৬ঃ সাব গ্রুপ ১—তিউনিসিয়া ২ আলজিরিয়া ১ ; তিউনিসিয়া ০ আলজিরিয়া ০ ; গ্রুপ ২—মরক্কো ১ সেনেগাল ০ ; সেনেগাল ২ মরক্কো ১ ; প্লে-অফ ঃ মরক্কো ২ সেনেগাল ০ (লা পামেজ)। গ্রুপ ৩—ইথিওপিয়া ৫ লিবিয়া ১ ; লিবিয়া ২ ইথিওপিয়া ০ ; গ্রুপ ৪—জাম্বিয়া ২ সুদান ২ ; সুদান ৪ জাম্বিয়া ২ (দ্বিতীয় ম্যাচে অতিরিক্ত সময়ে গোল করে সুদান গোলের গড় হিসাবে বেশি থাকায় জিতেছে)। গ্রুপ ৫—ক্যামেরুন ২ নাইজেরিয়া ১ ; নাইজেরিয়া ১ ক্যামেরুন ১ ; গ্রুপ ৬—ঘানা ‘বাই’ পেয়েছে।

দ্বিতীয় রাউণ্ড—তিউনিসিয়া ০ মরক্কো ০ ; মরক্কো ২ টিউনিসিয়া ২ ; (অতিরিক্ত সময়ে)।

লটারির মাধ্যমে জয় পরাজয় ঠিক হয়েছে। ইথিওপিয়া ১

সুদান ১; সুদান ৩ ইথিওপিয়া ১; নাইজেরিয়া ২ ঘানা ১; ঘানা ১ নাইজিরিয়া ১।

তৃতীয় রাউণ্ড—নাইজিরিয়া ২ সুদান ২; মরক্কো ২ নাইজিরিয়া ১; সুদান ৩ নাইজিরিয়া ৩; সুদান ০ মরক্কো ০; মরক্কো ৩ সুদান ০; নাইজিরিয়া ১ মরক্কো ০।

কে? কোথায়?

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
মরক্কো	৪	২	১	১	৫	২	৫
নাইজিরিয়া	৪	১	২	১	৭	৮	৪
সুদান	৪	০	৩	১	৫	৩	৫

মরক্কো বিজয়ী সাব্যস্ত হয়েছে।

মেক্সিকোয় ফাইনাল পর্যায়ের ফলাফল

গ্রুপ ১

রাশিয়া—০ মেক্সিকো—০

বেলজিয়াম—৩ এল সালভাদর—০
(ভ্যানমোয়ের—২ ও ল্যাম্বার্ট)

রাশিয়া—৪ বেলজিয়াম—১
(বাইশোভেটস—২ আসা-টিয়ানি ও খেমলেনিটিস্কি) (ল্যাম্বার্ট)

মেক্সিকো—৪ এল সালভাদর—০
(ভ্যালডেভিয়া—২ ফ্রাগোসো ও বাসুগুয়েন)

রাশিয়া—২ এল সালভাদর—০
(বাইশোভেটস ও মুনতিয়ান)

মেক্সিকো—১ বেলজিয়াম—০
(পেনা—পেনাল্টি)

গ্রুপ ২

উরুগুয়ে—২	ইজরায়েল—০
(ম্যানেবিও ও মুজিকা)	
ইতালি—১	সুইডেন—০
(ডোমিঙ্ঘিনি)	
ইতালি—০	উরুগুয়ে—০
সুইডেন—১	ইজরায়েল—১
(তারসেন)	(স্পিগলার)
সুইডেন—১	উরুগুয়ে—০
(ওভেগ্রান)	
ইতালি—০	ইজরায়েল—০

গ্রুপ ৩

ইংল্যাণ্ড—১	রুমানিয়া—০
(হার্স্ট)	
ব্রাজিল—৪	চেকোশ্লোভাকিয়া—১
(রিভেলিনো, পেলে, জেয়ার-জিনহো)	(পেত্রাস)
রুমানিয়া—২	চেকোশ্লোভাকিয়া—১
(নেগু)	(পেত্রাস)
ব্রাজিল—১	ইংলণ্ড—০
(জেয়ারজিনহো)	
ব্রাজিল—৩	রুমানিয়া—২
(পেলে—২ ও জেয়ার-জিনহো)	(এমারিক, ডুমিত্রাসে)
ইংল্যাণ্ড—১	চেকোশ্লোভাকিয়া—০
(ক্লার্ক—পেনাল্টি	

গ্রুপ ৪

পেরু—৩ বুলগেরিয়া—২

(গ্যালার্ডো, গুম্পিতাজ, কুবিল্লাস) (ডারমেণ্ড-জিয়েভ, বেনেট)

পঃ জার্মানি—২ মরক্কো—১

(সীলার, মুলার) (মহম্মদ হুডিমেন)

পেরু—৩ মরক্কো—০

(কুবিল্লাস—২ শ্যালে)

পঃ জার্মানি—৫ বুলগেরিয়া—২

(লিবুদা, মুলার—৩, সিলার)

(নিকোডমভ, কোলেভ)

পঃ জর্মানি—৩ পেরু—১

(মুলার—হ্যাটট্রিক) (কুবিল্লাস)

মরক্কো—১ বুলগেরিয়া—১

(মউহব) (জেশেভ)

কোয়ার্টার-ফাইনাল

পঃ জার্মানি—৩ ইংল্যাণ্ড—২

(বেকেনবাওয়ের, সীলার, মুলার)

(মুলারি ও পিটার্স)

ইতালি—৪ মেক্সিকো—১

(রিভা—২, রিভেরা, ডোমিঙ্ঘিনি) (গঞ্জালেস)

ব্রাজিল—৪ পেরু—২

(তোস্তাও—২, জেয়ারজিনহো, রিভেলিনো) (কুবিল্লাস, গেরাল্ডো)

উরুগুয়ে—১ রাশিয়া—০

(এস্‌পারাগো)

সেমি-ফাইনাল

ইতালি—৪ পশ্চিম জার্মানি—৩

(বনিনসেগনা, বার্গনিশ, রিভা, রিভেরা) (স্নেলিঞ্জার, মুলার—২)

ব্রাজিল—৩ উরুগুয়ে—১

(ক্লোডোয়ালডো, জেয়ারজিনহো, রিভেলিনো)

৩য় ও ৪র্থ স্থান-নির্ণায়ক খেলা

পশ্চিম জার্মানি—১ উরুগুয়ে—০

(মুলার)

ফাইনাল

ব্রাজিল—৪ ইতালি—১

(পেলে, জেয়ারজিনহো, গার্সন ও আলবার্তো) (বনিনসেগনা)

সবশেষে কে? কোথায়?

প্রথম—ব্রাজিল, দ্বিতীয়—ইতালি, তৃতীয়—পঃ জার্মানি, চতুর্থ—উরুগুয়ে।

সর্বকালের সেরা একাদশ
বনাম
'ওয়ার্ল্ড কাপ' সত্তরের বাছাই একাদশ

স্বপ্নের এগারোটি ফুটবলার সমন্বয়ে সেরা টিমটি তৈরি করার জন্যে ৩৫ টি ফুটবল উদ্যোগী দেশের ক্রীড়া সাংবাদিকরা ভোট দিয়েছিলেন। যাঁরা টিমে জায়গা পেয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকেই দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরে ওয়ার্ল্ড কাপের কোন না কোন খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন।

এই টিমের ফুটবলারদের এমনি বৈশিষ্ট্য তারা সাবেকি ১-২-৩-৫ বা আধুনিক ৪-২-৪ অথবা অত্যাধুনিক ৪-৩-৩ ছকের যে কোন একটিতে যখন খুশি নিজেদের সাজিয়ে নিয়ে খেলতে পারে।

নিঃসন্দেহে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ একাদশ। গোলকীপার লেভ ইয়াসিন গোল ছেড়ে এসে অবস্থা মত ফুলব্যাক খেলতেও সক্ষম। জালমা স্যান্টোস ও জিয়াসিন্টো ফ্যাচেত্তি এমন ধরণের ফুল-ব্যাক যাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ইয়াসিন ভাবতে পারে সে পর্বতের আড়ালে নিরাপদে গোল রক্ষা করছে। ববি চার্লটনকে যদি মিডফিল্ডের সেনাপতি বলে ধরা যায় তবে ফ্র্যানজ বেকেনবাওয়ের ও অ্যালফ্রেডো ডি স্টেফানো ওদের মনের মত দুই সহ সেনানায়ক। আসলে ওরা তিনজনই বিশ্ব একাদশের আক্রমণ রচনার পরিকল্পনা করে বিপক্ষের আক্রমণ নষ্ট করে দেবে।

হাঙ্গেরির জোসেফ বোজিক ডিফেন্সকে আক্রমণ, নিয়ন্ত্রণ ও প্রসারে পরামর্শ দেবে এবং রক্ষণ ভাগে মধ্যমণি থাকবে বিলি রাইট, যাকে হাল আমলের সুইপারের ভূমিকায় ষোল আনাই মানিয়ে যাবে।

সবার সামনে থাকবে সর্বকালের দুই শ্রেষ্ঠ স্ট্রাইকার পেলে ও হাঙ্গেরির ফেরেঙ্ক পুসকাস। কাঁটায় মাপা বুদ্ধি বৃত্তিতে ওরা গোলের

পাহাড় গড়বেই এবং এমন সব তাজ্জব পাশ দেবে যাতে স্ট্যানলি ম্যাথুজের মত বিজ্ঞ ফুটবলার ইংল্যাণ্ড টিমে তার সহ-খেলোয়াড়দের কাছ থেকে সব সময়েই ওই রকম পাশ আশা করেও পাননি। এমনি ভাবে যখন মাঠে গোলের পর গোল হবে তখন ডি স্টেফানো ও চার্লটন গোলের সিংহ ভাগে ভাগ বসাবে না—একি হতে পারে! কিন্তু ডি স্টেফানো ও পুসকাস পাশাপাশি খেলবে এ দৃশ্যও অভাবনীয়। সত্তরের ওয়ার্ল্ড কাপের খেলা শেষে একটি টিমও তৈরি করেছি যারা ওই শ্রেষ্ঠ একাদশের সঙ্গে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ফুটবল সমরে অংশ গ্রহণ করতে পারে ঃ—গোলকীপার—গর্ডন ব্যাঙ্কস (ইংল্যাণ্ড) ব্যাক—কার্ল স্নেলিঞ্জার (পঃ জার্মানি) ববি মুর (ইংল্যাণ্ড), অ্যালবারট সেসতারনেভ (রাশিয়া) মিডফিলড—গার্সন নুনেস (ব্রাজিল) হেক্টর শুম্পিতাজ (পেরু) অ্যালান বল (ইংল্যাণ্ড) ফরোয়ার্ড—জেয়ার ভেঞ্চুরা ফিলহো জেয়ার জিনহো (ব্রাজিল) জারড মুলার (পঃ জার্মানি) গিগি রিভা (ইতালি) তিয়োফিলো কুবিল্লাস (পেরু)।

গোল দুর্গের প্রধান রক্ষী
লেভ ইয়াসিন

যারা ফুটবল খেলে এবং বিশ্ব ফুটবলের সামান্য খোঁজ খবর রাখে তাদের কাছে বলতে হবে না কে লেভ ইয়াসিন। রাশিয়ার ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি দীর্ঘ এই গোলকীপারটির বিশ্ব জুড়ে এতই সুনাম। একদশক ধরে এই সুনাম নিয়ে ইয়াসিন রাশিয়ার গোলের দুর্গ রক্ষা করেছে এবং শেষে বিশ্ব একাদশে স্থান পাওয়াও ওর পক্ষে অসম্ভব হয়নি। সত্তরের মেক্সিকো অনুষ্ঠানেও ইয়াসিন হাজির ছিল, কিন্তু খেলেনি। এতে ইয়াসিনের কোন ক্ষোভের কারণ নেই। মেক্সিকো যাওয়ার আগে সে যেচেই বলেছিল, আমার জায়গায় আর একজন গোলকীপারের আসা

উচিত, যদিও ওর অতি বড় সমালোচকও স্বীকার করবেন, ইয়াসিন ওই কথাগুলো বলার সময় এতটা দক্ষতাসম্পন্ন ছিল যাতে তখনো তাকে রাশিয়ার এক নম্বর গোলকীপার বললেও অত্যুক্তি হতো না।

মেক্সিকোর আগে পর্যন্ত ইয়াসিন রাশিয়ান টিমের পক্ষে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে ৭০ বার। ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল পর্যায়ে খেলেছে আটান্নো, বাষট্টি ও ছেষট্টিতে।

ইয়াসিন ইউরোপীয়ান ফুটবলার অব দ্য ইয়ার সম্মান পাওয়ার পাঁচ বছর আগে সুইডেনের (১৯৫৮) বিশ্ব কাপ ফুটবলে ইংল্যাণ্ড ওই ইয়াসিনের জন্যেই ছুটি ম্যাচে রাশিয়ার গোলে বল ঢোকাতে পারেনি। অথচ এর কয়েক মাস বাদে ওয়েম্বলির খেলায় ইয়াসিনকে দলে না নিয়ে রাশিয়ানরা যে মস্ত ভুল করেছে তা তারা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল।

ইয়াসিন তখন খ্যাতির চূড়োয়। এর পরেই দেখে মনে হয়েছিল ইয়াসিনের খেলা পড়ে আসছে। বাষট্টির ওয়ার্ল্ডকাপে ইয়াসিন যখন তেমন সুবিধা করতে পারল না তখন ওই ধারণাটা সকলের বদ্ধমূল হয়েছে। কিন্তু এর ১৫ মাস বাদে ওয়েম্বলিতে ফিফা একাদশের হয়ে ইয়াসিন প্রকাশিত হল পুরনো মূর্তিতে। প্রথমার্ধে ইংল্যাণ্ডের যত তীব্র আক্রমণ এসেছে ইয়াসিন অক্লেশে তা রুখে দিয়েছে। সব সময়ই মনে হয়েছে এই বুঝি ইয়াসিনের রক্ষণদুর্গে ফাটল ধরল। এর মধ্যে পেনাল্টি বক্সের মাথা থেকে গ্রিভসের গোলার মত সট ইয়াসিন আটকে দিয়েছে। এই স্মরণীয় খেলার সময় অনেকেই দোনামনা হয়েছিল, তারা চোখের সামনে ইয়াসিনকে না অন্য কাউকে দেখছে। সেদিন ইয়াসিন তার কালো জার্সির পরিবর্তে পরেছিল হলদে জার্সি।

ওই সোভিয়েট ফুটবল তারকাটিকে যখন ইয়েরেভান অ্যাবারতের বিরুদ্ধে মস্কো ডায়নামোর হয়ে খেলতে দেখা গেল, তখন উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হয়ে একটি বিশ্ব রেকর্ডের উপমা

হাতে পেয়েছে—ওই খেলাটিতে ইয়াসিন তার গোলকীপার জীবনের ৩০০ তম ম্যাচটিতে পৌছয়। প্রসঙ্গত মস্কো ডায়নামো ১—০ গোলে জিতে সোভিয়েট সকার চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে।

এর আগেই ইয়াসিন তাদের এই অসাধারণ ফুটবল দক্ষতার জন্যে সর্বোচ্চ সরকারী সম্মান 'অর্ডার অব দ্য লেনিন' খেতাবও পেয়েছিল।

ইয়াসিন ফুটবল ইতিহাসের চিরকালই একটি জ্যোতিষ্ক রূপে জ্বল জ্বল করবে। কিন্তু সে যখন মাত্র ১৫ বছর বয়সে ফুটবল খেলা আরম্ভ করেছিল তখন একটুও ভাবতে পারেনি, ভবিষ্যতে তাকেই বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গোলকীপার হতে হবে।

ইয়াসিন এত ভাল খেলেছে যে স্পেনের প্রাক্তন বিশ্বখ্যাত গোলকীপার জামোরাও ওর প্রশংসায় বিরত থাকেনি। ১৯৬৪ তে, বার্সিলোনাতে ইউরোপীয় কাপ ফাইনালেব খেলার সময় দুজনেই একজায়গায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে।

ফুটবল জগতে জামোরা ছাড়াও চোকাশ্লোভাকিয়ার প্ল্যানিকা, রাশিয়ার অ্যাকিমোভ ঝোমকোভ ও ইংল্যাণ্ডের গর্ডন ব্যাঙ্কসের মত গোলকীপার দেখা দিলেও আপন গুনে ইয়াসিন সকলকেই ছাড়িয়ে গেছে।

জামোরার ছিল অভাবনীয় প্রতিক্রিয়া ও অদ্ভুত পজিসন জ্ঞান। এর উত্তরাধিকারী প্ল্যানিকাকে দেখা গেছে সে ওই সব জ্ঞান ছাড়াও সর্বক্ষণ গোল এরিয়া থেকে বেরিয়ে এসে খেলেছে, এবং সবসময়েই পেনাল্টি অঞ্চলের সর্বত্র নিজ প্রাধান্য বজায় রেখেছে।

ইয়াসিন ওদের চেয়েও এক কাঠি সরেস। উঁচুতে লাফানোয় ওস্তাদ হওয়া ছাড়াও পেনাল্টি এলাকার বাইরেও নিজের সক্রিয়তার পরিচয় রেখেছে। সর্বদাই একটি ব্যাক হিসাবে যেমন কাজ করেছে, অনুরূপ ভাবে পোক্ত ডিফেন্সের ভূমিকায় দলকে সাহস জুগিয়েছে।

ইয়াসিন কিন্তু প্রথমে ফুটবলার ছিল না। বারো বছর বয়সে

কারখানায় শিক্ষানবিশী কাজের অবসর সময়ে মাঝে মাঝে সুযোগ পেলে খেলাধূলায় যোগ দিত। খেলাধূলার ওর প্রথম প্রেম হল বাস্কেটবল। পরে আস্তে আস্তে সে ফুটবলের অনুরাগে ডুবেছে। প্রথমে খেলেছে ওয়ার্কশপের টিমে, আরও পরে কারখানার একাদশে এবং সবশেষে যোগ দিয়েছে মস্কো ডায়নামোতে।

মস্কো ডায়নামোর হেড কোচ মিখাইল ইয়াকুনিনের পক্ষে ইয়াসিনকে চট করে চিনে নিতে কোন অসুবিধাই হয়নি। মাত্র দুবছরের চেষ্টায় ইয়াকুনিন ইয়াসিনকে সবদিকে সমান জ্ঞান সম্পন্ন গোলকীপার করে তোলে। চুয়ান্ন সাল পর্যন্ত ইয়াসিন একদিকে ডায়নামো টিম ও অপরদিকে জাতীয় দলের হয়ে দারুণ খেলেছে। এই খেলার খাতিরে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের দর্শকই ওকে পরিয়েছে প্রশংসার মালা।

ইয়াসিনকে কখনো কখনো গোল লাইনের ৪০।৪৫ গজ দূরে এগিয়ে গিয়েও গোল বাঁচাতে দেখা যায়। এটা ওর কাছে অতি সহজ কাজ। ভেসে আসা বলের সঠিক রাস্তা সম্বন্ধে ইয়াসিন আগে থেকেই আঁচ করতে পারে। কোন প্রকারের আক্রমণ আসছে সে বিষয়ে ওর ট্যাকটিকসেও কোন ভুল নেই। কোন সময় কোথায় গিয়ে জায়গা আগলাতে হবে এ ব্যাপারটাও ওই বিখ্যাত গোলকীপারের অধিগত।

বুদাপেস্টে হাঙ্গেরির সঙ্গে ইউরোপীয়ান কাপের নির্বাচনী খেলায় হাঙ্গেরির প্লেয়াররা মুহুর্মুহু আক্রমণ করছিল। রাশিয়ার হাফব্যাক ইগর নেট্রো ভুলক্রমে নিজেদের স্টপারের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে জড়িয়ে পড়ায় হাঙ্গেরির ফরোয়ার্ড টিচি ফাঁক পেয়ে সরাসরি ইয়াসিনের মুখোমুখি হয়।

দেখা গেল টিচি গোলের দিকে ছুটে চলেছে আর ইয়াসিন একদৃষ্টে দেখছে। মাত্র দশ-বারো গজ দূরে এসেই টিচি সট করার জন্যে পা তুলল, পলকের মধ্যে ইয়াসিন ঝাঁপিয়ে পড়ে পতন রোধ করল।

ওয়ার্ল্ড কাপে গুডিসন পার্কে রাশিয়ার ও পঃ জার্মানির সেমিফাইনাল খেলা যারা দেখেছিল তারা ওই ম্যাচে ইয়াসিনের অনবদ্য গোলকীপিং-এর জন্যে তাকে কোনদিন মন থেকে মুছতে পারবে না। সারা ম্যাচের মন্থর ভাবটাও সকলে মেনে নিয়েছিল ইয়াসিনের গোলকীপিংয়ের জন্য।

তৃতীয় স্থান নির্ধারণের জন্য পর্তুগাল ও রাশিয়ার খেলায় দর্শকেরা হতবাক হয়ে ইয়াসিন ও ইউসেবিও ফুটবল দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখেছে। এই দুই ফুটবলারের লড়াইয়ের তীব্রতা বেশি অনুভূত হয়েছে পেনাল্টি কিকের সময়ে।

ইউসেবিও এমন ভাবে কিকটি মারে যা উঁচু হয়ে ইয়াসিনের কাছ থেকে বহু দূর দিয়ে গিয়ে গোলে ঢোকে। এটি ধরার জন্য ইয়াসিনের আর দ্বিতীয় কোন সুযোগ ছিল না।

খেলার শেষে দর্শকদের পিঠ চাপড়ানির আনন্দের মধ্যে ইয়াসিন মাঠ থেকে সাজঘরে প্রবেশ করে। রেফারি ও লাইন্সম্যানরাও একাজে বিরত থাকেনি।

পর্তুগালের অর্ধেক প্লেয়ারেরই ইচ্ছা ছিল ইয়াসিনের সঙ্গে জার্সি বদল করার। এই সুযোগ পাওয়ার দিক থেকে তারা গুণতিতে বেশি হওয়ায় ইয়াসিনের ঠোঁট বেয়ে নেমে এসেছে প্রাণ খোলা আবেগ।

নিঃসন্দেহে বলা যায় মাঠে ইয়াসিনের খেলার ধরণ লক্ষ্য করলে যে কোন গোলকীপারের বোধোদয় ঘটবে। ব্রাজিল টিম ৪-২-৪ পদ্ধতিতে খেলতে সুরু করলে রাশিয়ার সাংবাদিকরা একবাক্যে স্বীকার করে ওই 'চারব্যাক' ব্যাপারটা তেমন কিছু নতুন নয়। কারণ রাশিয়ান টিমে তিনজন রেগুলার ব্যাকের সঙ্গে ইয়াসিন যে ভাবে মিলেমিশে খেলেছে তাতে 'চারব্যাকে'র গুণাগুণ তাদের মুঠোর মধ্যে ।

ফুটবলে আন্তর্জাতিক দিক থেকে রাশিয়ান টিমকে ইয়াসিন প্রথম সাহায্য করেছিল মেলবোর্ন অলিম্পিকের স্বর্ণ পদক জয়ে।

চারবছর পরে ইউরোপীয়ান নেশানস কাপেও ইয়াসিন তার কর্তব্যে অবহেলা করেনি।

ইয়াসিনের জন্ম হয় মস্কোতে, ১৯২৯ সালে। স্কুল ছেড়ে ইয়াসিন যখন হাওয়াই জাহাজ তৈরির কারখানায় কাজে ঢোকে তখন তার বয়স মাত্র চৌদ্দ। তবে সে সরস্বতীর দুয়ার থেকে সরে যায়নি কেননা পড়াশুনার জন্যে সে নৈশ স্কুলেও ভর্ত্তি হয়েছে। হাতে একটু ছুটি পেলেই ইয়াসিন ছুটেছে নিরালায় মাছ ধরতে। ফুটবল খেলা ছাড়াও তুষার হকি, বাস্কেটবল, ভলিবল, অ্যাথলেটিকস ও ড্রাইভিংয়েও ইয়াসিনকে ব্যাস্ত থাকতে দেখা গেছে।

রাশিয়ার স্পার্টাক দলের প্রাক্তন সেণ্টার হাফ স্টারোসটিনের মতে বাস্কেটলার হিসাবে অভিজ্ঞতা থাকায় ইয়াসিন গোল বাঁচানোর কাজে অত পারিদর্শিতা অর্জন করেছে।

এত বর্ণময় চরিত্রের ফুটবলার ইয়াসিন তার বয়সের ভারের কথা চিন্তা করেই হয়তো বা পরবর্তী তরুণদের সুযোগ করে দেওয়ার পক্ষে। মেক্সিকোর ওয়ার্ল্ড কাপ শেষে ইয়াসিন নিজের ভবিষ্যত ভেবে ফেলেছে—তাকে আর রাশিয়ান টিমে দেখা যাবে না। তবে নিজের ক্লাব মস্কো ডায়নামোর হয়ে এই চল্লিশ বছর বয়সেও রোজ গোল রক্ষা করবে, এই শর্তে ইয়াসিন সম্মতি জানিয়েছে।

সাঁইত্রিশ বছর বয়সেও ব্রাজিলের মত টিমে অনায়াসে নিজ ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার ধারে খেলা যায়, ব্রাজিলের জালমা স্যাণ্টোস তা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ রেখেছেন। শুধু তাই নয়, ১৯৫৪ তে যে ওয়ার্ল্ড কাপের খেলা দেখেছে এ হেন পুরনো দর্শকও ওয়েম্বলিতে ছেষট্টির ওয়ার্ল্ড কাপে জালমাকে ব্রাজিলের হয়ে আবার খেলতে দেখে বেশ অবাক হয়েছিল। 'আবার' কথাটা ব্যবহার করেও ওই বিজ্ঞ ফুটবলারটির যথাযোগ্য দক্ষতা প্রকাশিত হয়নি এটাই বলব। কারণ ওয়েম্বলির ওয়াল্ড কাপ নিয়ে জালমা স্যাণ্টোস পরপর চারটি বিশ্ব কাপ ফুটবল অনুষ্ঠানে খেলেছে—যা খুব কম ফুটবলারেরই ভাগ্যে ঘটে।

ওই ছেষট্টির ওয়ার্ল্ড কাপ পর্যন্ত জালমা টানা চৌদ্দ বছর ব্রাজিলের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচে নেমেছে। এই ফাঁকে ও জড়ো করেছে ১০০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার রেকর্ড। এর মধ্যে ওয়ার্ল্ডকাপে তুবার সোনার মেডেল পাওয়ার ঘটনা তো আছেই।

জালমা স্যাণ্টোসের চোদ্দ বছরের ফুটবলারের জীবন কাহিনীতে ঝলমলে ঘটনারও অভাব নেই। সাও পোলোতে জন্মের বছর ষোল পর থেকেই ওর প্রতিযোগিতামুলক ফুটবল জীবনের সুরু। নাম হচ্ছে-হবে এই সম্ভাবনায় ভরা প্রথম দিনগুলোর সঙ্গে জালমা ফুটবলে লাথি মারলেই পয়সা পাওয়ার সুযোগটার মুখোমুখি হয়নি। তবে পামিরাস ক্লাবের খাতায় নাম লেখাতে ওর সৌখিন জীবনে ছেদ পড়ে। খ্যাতির তকমাগুলো ওর চরিত্রের গহনা হয়ে উঠেছে। সাওপোলো, ব্রাজিল ও দঃ আমেরিকার ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে মেডেল পাওয়ায় জালমার পক্ষে কোন অসুবিধা হয়নি।

এত নাম ডাক হলেও বিশ্বের সেরা একাদশের একজন হতে জালমাকে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। তেষট্টিতে ইংল্যাণ্ডের

বিপক্ষে সাতষট্টি ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট ওই ফুটবল ব্যাকটিকে বিশ্ব একাদশে যখন নেওয়া হল তখনি ওর স্বপ্ন সফল হয়েছে।

খাটো চেহারার জালমা তার ফুটবলার জীবনে যেমন চটপটে স্বভাবের পরিচয় রেখেছে তেমনি উত্তর জীবনেও 'পাওয়ার ফুটবল' এর তীব্রতাকে মানিয়ে নিয়েছে। ৪-২-৪ ছকের রেওয়াজ যখন চালু হল তখনো যেমন জালমা চট করে ওই নতুন ফুটবল রীতিতে অধিপত্য করেছিল তেমনি ৪-৩-৩ ছকের আবিষ্কারের সময়ও পিছিয়ে থাকেনি।

শেষের দিকে ওর চটপটে ভাবটায় ভাঁটা পড়লেও ধেয়ে আসা অল্প বয়সের কমবয়সী উইঙ্গারদের ঠাণ্ডা করতে জালমা তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে কাজে লাগিয়েছে, তাই জালমা স্ট্যাণ্টোস নামটা মনে এলেই একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ফুটবলারের ছবি ভেসে ওঠে।

———

বিচক্ষণ ফুটবলার ফ্যাচেত্তি

লণ্ডনে ওয়েম্বলিতে ছেষট্টির বিশ্বকাপের খেলায় উত্তর কোরিয়ার নাম না জানা প্লেয়ারদের কাছে হঠাৎ হেরে যাওয়ায় ইতালি টিম নাকালের এক শেষ হয়েছে। দেশে ফিরেই রাগে জ্বলে যাওয়া ফুটবল প্রেমীদের মাঝে পড়ে পচা ডিমের খোলার সঙ্গে গালাগালও ইতালির প্লেয়াররা কম খায়নি। তাই সত্তরের ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে যাওয়ার আগে ইতালির দলনায়ক ফ্যাচেত্তিকে তার টিমের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, আমাদের ছেষট্টির ব্যর্থতা এক দুঃস্বপ্ন বিশেষ। এই অপমান ঘোচাতে আমরা মেক্সিকোতে জিতে ফিরবই। যদি তেমন ব্যর্থতা আসে তাহলেও অন্ততঃ সেমিফাইনাল যাবই।

ফ্যাচেত্তির কথাগুলো যে খুব খেলো নয় তা হাতনাতে প্রমাণ

মিলেছে। ইতালি ব্রাজিলের হাতে শোচনীয় ভাবে হারলেও আর যাই হোক ফাইনালে তারা খেলেছিল। তাহলে এটাও প্রমাণ হল, ফ্যাচেত্তির অন্তর্দৃষ্টি অমূলক নয়। ওর ফুটবলের বোধশক্তিও বেশ তুখোড়।

আর হবে নাই বা কেন ? জগতে ওর মত বুদ্ধিমান লেফটব্যাক জুটি মেলা শক্ত। ইতালির ইণ্টার মিলান দলেও এই ঘুঁটিটিকে আলগা করতে অনেক ফুটবল টিম হিমসিম খেয়েছে।

জেনে রাখা ভাল এই ইণ্টার-মিলানের হয়ে জিয়াসিণ্টো ফ্যাচেত্তিব আত্মীয়তা ক্রমেই বেশ পুরু হয়েছে। মাত্র আঠার বছর বয়সে ফ্যাচেত্তি সেই যে ইণ্টার মিলানের হয়ে খেলতে নেমেছিল সত্তরের ওয়ার্ল্ড কাপ পর্যন্তও সেই আত্মীয়তার বন্ধন ছেঁড়েনি। ইণ্টার মিলানে খেলার সুযোগে ইতালির জাতীয় দলকে প্রতিনিধিত্ব করার প্রথম সুযোগ জুটেছে মাত্র একুশ বছর বয়সে। নিয়মনিষ্ঠ ও দৃঢ়চেতা ফ্যাচেত্তির সব সময়ই যে তাব দলের পতন রোধ করে থাকে সে ধারণাটা ভুল। পায়ে বল পেলে যদি তার চোখে পড়ে সামনে বাঁ দিক বরাবর রাস্তাটা পরিষ্কার তবে দ্রুত ছুটে গিয়ে প্রতিপক্ষের এলাকায় গেল-গেল রব ফেলে দেয়।

সত্তরে ফ্যাচেত্তি পড়েছে ২৮ এর কোঠায়। টাকা পয়সার দিক থেকে ওকে বলা হয় ইউরোপীয় ফুটবলারদের মধ্যে অন্যতম পয়সাওয়ালা ফুটবলার।

কিন্তু মা লক্ষ্মীর চোখে ফ্যাচেত্তিকে দেখলে খুবই ভুল করা হবে। ষাট থেকে সত্তর এই দশ বছরে ফ্যাচেত্তির ফুটবল রেকর্ডটিও সমভাবে মহামূল্য সম্পদ। ওই সময়টুকুর মধ্যে ফ্যাচেত্তি তিনটি ইতালিয়ান লীগ চ্যাম্পিয়শিপ মেডেল পেয়েছে, তুটো চ্যাম্পিয়নশিপ পদক পেয়েছে এবং ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ন কাপের বিজয়ীর মেডেল বুলিয়েছে ওই তু'বার। ইণ্টার-কন্টিনেণ্টালে ফ্যাচেত্তি খেলেছে তু'বার এবং ওই কৃতিত্বের টানা ইতিহাসে ফ্যাচেত্তি পঞ্চাশবার ইতালির জার্সি গায়ে চড়িয়েছে।

ওর ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতা বিশ্বের অনেক ফুটবলারের আরাধ্য বস্তু। তবে টিমের সংহতির সঙ্গে ওর খেলার ধরণ অনেক সময় বেখাপ্পা হয়ে ওঠে। আধুনিক ফুটবলে যে কজন ফুল ব্যাক মাঠের ধার বরাবর জায়গা ফাঁকা করে নিয়ে অপর পক্ষের উপর আক্রমণ ছড়াবার চেষ্টা করে তাদের মধ্যে ফ্যাচেত্তিও একজন। এতে ইতালি টিম ডিফেনসিভ ট্যাকটিকসের বজ্র আঁটুনিতে মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে—তবে ওই কদাচিত দৃষ্ট দক্ষতাই ফ্যাচেত্তির পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে ঝরেছে। হঠাৎ গোল—স্কোরারের সুনাম এজন্যেই ওর প্রাপ্য। লম্বা পা ফেলে ফ্যাচেত্তি যেমন প্রতিপক্ষেব রক্ষণভাগে ত্রাস হয়ে ওঠে তেমনি 'ব্যাক-প্যাডলার' হিসাবেও ফ্যাচেত্তি অনন্য। এই কাজ অতি যত্নে পালন করতে গিয়ে ফ্যাচেত্তি খুব কমই ভুল করে।

———

অল রাউণ্ডার ফুটবলার বোজিক

হাঙ্গেরির জোসেফ বোজিকের কথায় বাধ্য হয়েই মুখবন্ধটা বড় করছি।

বিশ্ব ফুটবল ইতিহাসে পাঁচ দশকের প্রথম অংশটি অধিকার করে রেখেছে অসাধারণ হাঙ্গেরি ফুটবল টিম। তাই পঞ্চাশ দশকের কথা পাড়তেই ফুটবল ঐতিহাসিকরা গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠেন—এবার আরম্ভ হল হাঙ্গেরির ফুটবল উত্থান। কিন্তু এর কিছুদিন আগে দ্বিতীয়, বিশ্ব যুদ্ধের ডামাডোলে সমস্ত জাতটাই লৌহ প্রাচীরের ওধারে অন্তর্হিত হয়েছিল।

কিন্তু পঞ্চাশ সনে আবার ফুটবল মাঠে নেমে অষ্ট্রিয়াকে হারাতেই ঘটল হাঙ্গেরির পুনরভ্যুত্থান। পরবর্তী কালে ওদের ফুটবল বিক্রম সারা ইউরোপ ছেয়ে ফেলেছে। বাহান্নোতে হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে

হাঙ্গেরির বিজয় ফুটবল-বিশ্বে ওদের ভূমিকা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এর পরের বছরে হাঙ্গেরি গিয়েছে ইংল্যাণ্ডের মাঠে খেলতে। তখন ইংল্যাণ্ড টিমে স্ট্যানলি ম্যাথুজ, বিলি রাইট ও অ্যালফ র‍্যামজের মত ঝানু ফুটবলারদের ষোল আনা প্রতাপ চলেছে। এ সত্ত্বেও হাঙ্গেরির সামনে ইংল্যাণ্ড দাঁড়াতে পারেনি। ইংল্যাণ্ড হেরেছিল ৩—৬ গোলের ব্যবধানে, যারা খেলা দেখেছিল তারা সেদিনের হাঙ্গেরি টিমকে কোনদিন ভুলতে পারবে না।

ওই ম্যাচে পুসকাসের বাঁ পায়ের 'গোলার' মত শট্, কোজিসের বুদ্ধিদীপ্ত বল কন্ট্রোল ও সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিদেকুটির সদা তৎপরতা ও জিবরের গোল ক্ষুধা ইংল্যাণ্ডের রক্ষণভাগ বুঝে উঠতে পারেনি। তবে ফুটবল এয়ীকে ক্রমাগত যে আক্রমণের রসদ যোগাচ্ছিল সে হল গতিশীল, বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী রাইট হাফ জোসেফ বোজিক। বোজিকের মূলধন ছিল গতিবেগ, প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব ও শারীরিক সক্ষমতা।

ফুটবল পণ্ডিতদের মতে এত গুণের সমন্বয় হওয়া খুব কমসংখ্যক ফুটবলারের ভাগ্যেই জুটেছে। অনেকে আবার এও বলেন ফুটবলারদের মধ্যে বোজিকের মত সম্পূর্ণ অল রাউণ্ডার জুটি মেলা ভার।

পরিমিতি বোধটাও বোধহয় বোজিকের আর একটি গুণ। বুদাপেস্টের মাঠে বাষট্টিতে ফুটবলজীবন থেকে অবসর নেওয়ার সময় উরুগুয়ের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরি ফলাফল করেছিল ১—১। হাঙ্গেরির একমাত্র গোলটিও বোজিকই করেছে। বিশেষ নজরের প্রয়োজন, হাঙ্গেরির হয়ে বোজিকের এটি ছিল ১০০টি ম্যাচ।

তখন জোসেফের বয়স ৩৭। আশ্চর্যের বিষয় বোজিক ওই ম্যাচটিতে ফরোয়ার্ড হিসাবে খেলছিল। প্রসঙ্গতঃ বিখ্যাত হনভেদ টিমে যখন চান্স পায়, তখন ওখানেও ফরোয়ার্ডেই খেলেছে।

সাতচল্লিশে হাঙ্গেরি টিমে বোজিক নেমেছিল রাইট হাফে। আবার ভিপ্লানোতে জোসেফ খেলেছে সেণ্টার হাফে। ভাল কথা,

ওই সময়ে বোজিক হাঙ্গেরির পার্লামেন্টেও জায়গা করে নিয়েছিল। আবার ফুটবলের কথা, বাহান্নোর ওলিম্পিকে হাঙ্গেরি জেতায় বোজিক পেয়েছিল স্বর্ণ পদক।—চুয়ান্নোর ওয়ার্ল্ড কাপে জোসেফ পেয়েছে রূপোর চাকতি। দুর্ভাগ্য বোজিকের নয় দুর্ভাগ্য সারা হাঙ্গেরি টিমের। পঃ জার্মানির কাছে ওদের হার স্বীকারকে সম্পূর্ণ[illegible] নির্মেঘ আকাশ থেকে বাজ পড়ার মত লাগে।

আমার মতে বোজিক এর চেয়েও বিস্ময়কর। আমি ভারতের মাঠে খেলা দেখতে দেখতে একটা পরিচিত দৃশ্য দেখেছি, ফরোয়ার্ড লাইনে খেলে এমন ফুটবলার বয়সের চাপে শেষে পিছনে ডিফেন্সে খেলতে থাকে। ওদের মতামত—বয়স বাড়লেই খাটার শক্তি ক্রমশঃ কমে আসায় এবং নিজেদের গতির ভাণ্ডারে টান পড়ায় ওরা ডিফেন্সে খেলতে বেশি পছন্দ করে। যদিও ভারতীয় ফুটবলাররা বোজিকের নখের যোগ্য নয়—তবু বোজিকের জীবনী একটা জিনিস শেখাচ্ছে—সে পড়তি বয়সেও ফরোয়ার্ড লাইনে খেলেছে। সেসময়ে হাঙ্গেরি টিমে ওর মত কার্যকরি লিংকম্যানও খুবই কম চোখে পড়েছে—এটাই একটা এভ্ভাবেস্ট প্রমাণ শিক্ষা।

———

দীর্ঘ দিন ধরে কেউ কোন খেলা খেললে সময়বিশেষে ক্রীড়া উৎসাহীরা সেই খেলোয়াড়টির আদি অন্ত যোগ দিয়ে এক নীট ফল বার করার চেষ্টা করেন। রাখালের হারিয়ে যাওয়া গরু খোঁজার মত ওই অনুসন্ধান কাজের মধ্যে এক এক জায়গার দৃষ্টান্তগুলো এত বড় হয়ে দেখা দেয় যে সেগুলোকে আগের ঘটনার পাশে রেখে যাচাই করতে গিয়ে ধরা পড়ে—এমনটিতো এর আগে কখনো হয়নি। এই ধরণের রেকর্ড আহরণকারী ফুটবল ক্রীড়ানুরাগীদের কাছে ইংল্যাণ্ডের উলভার হ্যামটন ওয়াণ্ডারার্সের ফুটবলার বিলি রাইট নামটা এক অমূল্য সম্পদ।

বিশ্ব ফুটবলারদের মধ্যে রাইটই সর্বপ্রথম একশোটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার সৌভাগ্য অর্জন করেন। প্রথম শ্রেণীর ফুটবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রাইট যখন সরে দাঁড়ান তখন তার ১০৫টি ম্যাচ খেলা হয়ে গেছে। এব মধ্যে ৯৫বার ইংল্যাণ্ড দলকে আন্তর্জাতিক ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ওইসব সুনাম পেতে বিলি রাইট ব্যয় করেছেন মাত্র তেরটি বছর।

ওই তেরটি বছরেই রাইট ছিলেন ইংল্যাণ্ড রক্ষণভাগের মেরুদণ্ড। কখনো দেখা গেছে রাইট রাইট হাফে খেলছেন কখনো বা সেণ্টার হাফ পজিসনে। তবে রাইট প্রেমীরা সবসময়েই চেয়েছে বিলি পাঁচ নম্বরে সেণ্টার হাফের জার্সি পরুক। সেণ্টার হাফে খেলানোর জন্যে ওর ফুটবল ফ্যানরা বেশি পাগলামি দেখাত কারণ তাদের মতে বিপক্ষের যতবড় [illegible]য়ার্ডই হোক না কেন সে বিলি রাইটকে পেরিয়ে ইংল্যাণ্ডে[illegible]ল এলাকায় ঢোকার আগে দারুণ চিন্তায় পড়বে—কোন প[illegible] ভাবে সদা সজাগ বিচক্ষণ রাইটকে ফাঁকি দেওয়া যায়।

তবে তারা এও' স্বীকার করেছে, দ্রুত ও চতুর ফুটবলারদের পক্ষে রাইটকে ধাঁধাঁয় ফেলা হয়তো সম্ভব ছিল কিন্তু বিলির

নাছোড়বান্দা অথচ সুন্দর বাধাদানের ভঙ্গিকে এড়িয়ে যাওয়া ছিল যথেষ্ট কষ্টকর কাজ।

বাধাদানের ব্যাপারে বিলি রাইটের এই একাগ্রতার সঙ্গে ওর সহজাত গুণগুলির প্রত্যক্ষ মিল খুঁজে পাওয়া. গেছে। উদাহরণতঃ বিলি আজীবন উলভার হ্যামটন ওয়াণ্ডারার্সের হয়েই খেলেছে। এই উলভারহ্যামটনেব টিমই রাইটের মত খেলায়াড়দের সহায়তায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ইংল্যাণ্ডের বাইবেব টিমের সঙ্গে খেলায় জিতে প্রভূত সম্মান এনে দিয়েছে। তখন একটা রব ওঠে—দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের আগে ইংল্যাণ্ড টিম কি আর এমন খেলতো। কথাটা শেষে এমন নিষ্টুব সত্যিতে পরিণত হয়েছিল যে বাইরের ফুটবল দেশগুলি ইংল্যাণ্ডেব ফুটবল শক্তিকে কোন মতে গ্রাহ্য করতে রাজি ছিল না।

এ সম্বন্ধে বিলি বাইটেব সঙ্গে আলোচনা করলে সে বলছে "ওদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইংল্যাণ্ডেব কিছুই যায় আসে না।" রাইটের কথাটা কতটা যুক্তিসম্মত তা বেকর্ড বই বলে দিচ্ছে—ওই সময় ইংল্যাণ্ড খেলেছিল একশো পাঁচটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ-এর মধ্যে ঘরে বাইরে সব মিলিয়ে হেরেছিল ২১ বার।

রেকর্ড বইয়ের ওই হিসাবানুযায়ী বলা যায়—বিদেশীরা যতটা বাড়িয়ে বলত ইংল্যাণ্ড টিম ততোটা ঠুনকো ছিল না। কিন্তু বেকর্ড বই একটা জিনিষ টুকে রাখতে পারেনি—বিলি রাইট তার অনমনীয় ভঙ্গিতে কত হাজার বার বিপক্ষের আক্রমণের সঙ্গে নিজের কঠিন আত্মরক্ষার ঢালটি এগিয়ে দিয়েছে ও পরক্ষণেই তেড়ে ফুঁড়ে খেলে সতীর্থদের উৎসাহ দিয়েছে।

তবে উনষাট সালের এগারই এপ্রিল, (ইংল্যাণ্ড বনাম স্কটল্যাণ্ডের খেলা) যেদিন রাইট শততম আন্তর্জাতিক ম্যাচটি খেলে রেকর্ড করে সেদিনের ছবিটি চিরকাল মনে রাখার মত। রাইটের ওই দিনের খেলায় এত স্নায়ুর দৌর্বল্য প্রকট হয়েছিল যে রাইট তার আসল খেলা দেখাতে পারেনি। তবে রাইট কি করে এই প্রসঙ্গের রদবদল করে

সেটাই দেখার জন্যে দর্শকরা আগ্রহে ঝুঁকে পড়েছিল। দর্শকরা ভাল করে নিরীক্ষণ করেছে, ওর মাথার সোনালী চুল, সদাহাস্যময় মুখচ্ছবি। ওই মুখের হাবভাব বলে দিচ্ছিল রাইট বলতে চায়—ঘাবড়াবার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। রাইটের খেলার ধরনে ওর অথর্বতা বড় করুণ ভাবে ফুটে উঠেছে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের আধিক্য ওকে ক্ষমা করতে পারেনি। রাইটের এত নিপ্প্রভ হওয়ার কারণটা ভাবতে গেলে কেমন যেন খটকা লাগে। প্রতিপক্ষ স্কটল্যাণ্ডের ফরোয়ার্ডরাও তো তেমন সংহতি দেখাতে পারছিল না। ওরা যেমন পদে পদে ভুল করছিল রাইটও অসহায়ভাবে ওদের পিছু নিয়েছে। খেলা যত এগিয়েছে রাইটের ভুলের স্তূপ উঁচু হয়ে উঠেছে। পাসগুলো যেখানে যাওয়া উচিত যথাযথভাবে সেখানে যাচ্ছিল না। সবই যেন গুলিয়ে যাওয়ার পরিণতি। খেলার মধ্যে দিয়ে যে রাইট এর আগে কেমন ভাবে খেলা উচিত তা শিখিয়েছিল, এবার—সকলের সামনে খেলার মধ্যে দিয়ে ঘোষণা রাখল—রাইট ছুটি চায়।

———

চিত্তাকর্ষক বিপজ্জনক বেকেনবাওয়ের

কয়েকটি কথায় পঃ জার্মানির ফ্রানজ বেকেনবাওয়েরকে আঁকতে হলে বলতে হয় চলতি বিশ্বফুটবলে বেকেনবাওয়ের এক জ্বলজ্বলে নক্ষত্র। ফুটবল মাঠ থেকে অস্ত গেলেও যার আভা চির অম্লান থাকবে—এটাই আশা করা যায়। কলা কৌশল, শক্তি মত্তা, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া, বল পাশ করার নির্ভুল জ্ঞানে, বিপক্ষকে ধ্বংস করার অমানুষিক ক্ষমতা, এইসব উপাদানের সমন্বয়ে বেকেনবাওয়ারের ফুটবল সৌধ তৈরি হয়েছে।

মেক্সিকোয় খেলতে যাওয়ার আগে ফ্রানজের বয়স ছিল ২৪। পারিবারিক জীবনে বেকেনবাওয়ের তিন সন্তানের জনক। এই জার্মান

যুবক ফুটবল মাঠে দক্ষ মিডফিলডের চরিত্রে সময়ানুযায়ী আত্মরক্ষা ও আক্রমণ দুই পন্থাতেই সম্মতি জানিয়েছে। বেকেনবাওয়েরের এই ফুটবল চটক ফুটবলার ব্যবসায়ীদের দেশ ইতালির ফুটবল কর্মকর্তাদেরও চোখে রঙিন নেশা জাগিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওরা চেয়েছে পঃ জার্মানি থেকে বেকনবাওয়েরকে নিয়ে যাবে। টাকাও ছড়িয়েছে প্রচুর। কিন্তু বেকেনবাওয়েরকে টলানো যায়নি। ফ্রানজ তার বান্দেশ্লিগার ক্লাব বেয়ার্ন ম্যুনিখেই থেকে গেছে।

কিন্তু ছোট্ট কথা থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেখতে গেলে বেকেন বাওয়ের ভূমিকার অনেকগুলো দিকে চোখ পড়ে যাবে যা এড়িয়ে যাওয়া খুবই মুস্কিল। পঃ জার্মানির যে টিমটি মেক্সিকোর সত্তরের ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে গিয়েছিল তাদের গড় বয়স ছিল ২৬, অথচ বেকেন বাওয়েরের বয়স '২৪' হওয়ায় সেই ছিল দলের কনিষ্ঠ ফুটবলার। অল্পবয়সী বেকেনবাওয়ের পঃ জার্মান যুবক ফুটবলারদের এক বিশিষ্ট প্রতিনিধি। ছেষট্টির ওয়ার্ল্ডকাপে প্রথম খেলতে নামার আগে বেকেনের অভিজ্ঞতা ছিল মাত্র ৯টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের। অষ্টমবারের ওয়ার্ল্ডকাপে সকলকে তাক লাগিয়ে সে যখন রানার-আপ মেডেল পাওয়ার জন্যে ওয়েম্বলির বিজয় মঞ্চের দিকে এগিয়ে যায় তখন শুনতে পেল অগণিত ফুটবল দর্শকের হাততালি—সকলেই ফ্রানজের সমর্থক। টুর্নামেন্টের সেরা উইংহাফ নামেও বেকেনবাওয়ের সুনাম পেয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে পঃ জার্মানি ইংল্যাণ্ডের কাছে কেন হেরেছে তার জন্যে যুক্তি দেখানো হয়—ববি চার্লটনকে আটকানোর জন্যে বেকেন বাওয়েরকে ডিফেনসসিভ খেলতে বলায় সে তার নিজের খেলায় খেলতে পারেনি। লম্বা (৫ ফুট সওয়া এগারো ইঞ্চি) সুপুরুষ চিন্তাশীল এই ফুটবলারটি তার নিজের ক্লাব বেয়ার্ন ম্যুনিখের স্তম্ভ সরূপ। এই ক্লাবের হয়ে খেলার সময়ে মাত্র চার বছরের ভিতরে বেকেনবাওয়ের দুটি জার্মান কাপ উইনার্স মেডেল পেয়েছে এ ছাড়াও একবার লীগ চ্যামপিয়ান-শিপ পাওয়ার এবং ইউরোপিয়ান কাপ বিজয়ে স্বর্ণ পদক জেতার

নজিরটিতো রয়েছেই। বেকেনবাওয়ের মেক্সিকোতে যাওয়ার আগে একবার আহত হওয়ার কারণ ছাড়া পঃ জার্মানি দল থেকে কোনবার বাদ পড়েনি। গোল করার ক্ষমতা ও গোল করার রাস্তা তৈরি করার পারদর্শিতায় বিরোধী দলের চোখে বেকেনবাওয়ের এক চিত্তাকর্ষক বিপজ্জনক ফুটবলার।

ফুটবলের যাত্নকর স্ট্যানলি

জীবদ্দশায় যে কতিপয় ফুটবলারকে কল্পনার খোলস পরিয়ে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে—তাদের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের স্ট্যানলি ম্যাথুজ একজন।

ইংল্যাণ্ড ফুটবলে ম্যাথুজের যুগ আরম্ভ হয়েছিল বত্রিশ সালে। তার শেষ হয়েছে পঁয়ষট্টিতে। পঁয়ষট্টিতে ম্যাথুজ তার ফুটবল জীবনকে বিদায় কুর্ণিশ জানিয়েছে এবং তার অতি প্রিয় স্টোক সিটি ক্লাবকেও।

এই স্টোক সিটি বলতেই এর ছোট পরিচয় রাখার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ক্লাব হিসাবে ইংল্যাণ্ড ফুটবলে এর রবরবা নেই। স্টোক সিটির যত্র আয় তত্র ব্যায়—এই ভাবেই বছর গুজরান চলত। স্বল্প আয়ের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখাই ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছে এক বিরাট দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ম্যাথুজের মত ফুটবলের সহজাত শিল্পীও ওই ক্লাবের সঙ্গে নিজের ভাগ্য বেঁধে ফেলেছিলেন। সহজাত শিল্পী কথাটা এ জন্যেই বললাম, ম্যাথুজের বল আয়ত্তে রাখার জ্ঞানটি ছিল অবিশ্বাস্য উঁচু পর্যায়ে বাঁধা। শেষে এও বিশ্বাস করতে হয়েছে ফুটবলটা যেন ওর দেহেরই একটা প্রয়োজনীয় কলকব্জা। আবার শুধু বল কন্ট্রোল বল্লে ম্যাথুজের ফুটবল পোষ মানানোর মাত্র একটা দিক বলা হবে। সর্পিল ভঙ্গিতে

চলাফেরা, অবস্থা মতে বিচারশক্তির ভৌতিক বিন্যাস, এবং অসীম ধৈর্য ধারণশক্তি ম্যাথুজকে অন্য ফুটবলার থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করেছে।

ম্যাথুজের বড় হওয়ার মধ্যে কিছুটা অবদান আছে স্টোক সিটি ক্লাবের। আর বাকি অংশটা তৎকালীন কয়েকজন উন্নতমানের ফুটবলারের যাদের ভাল খেলার মাধ্যমে ম্যাথুজকে দিয়েছে আরও বড় হওয়ার প্রেরণা। ১৯৩৭এ ওই স্টোক সিটি ক্লাবের ফরোয়ার্ড লাইনে তিনজন ছিল ইংল্যাণ্ড খ্যাত খেলোয়াড়। রাইট আউটে ম্যাথুজ। জনসন লেফট আউট এবং ফ্রেডি স্টিল সেণ্টার ফরোয়ার্ড পজিসনে। জনসনের মধ্যে ছিল পুরোপুরি সাবেকি ঢঙের ফুটবল আঁকড়ে থাকার প্রচেষ্টা। স্টিলের সবিশেষ দুর্ভাগ্য সে চোট পেয়ে খেলা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। এই দুজনের পাশে ম্যাথুজের স্বত্তা, বৈচিত্রময় শৈল্পিক নৈপুন্য নানাদিকে কার্যকরি হয়েছে। তবে ম্যাথুজের প্রতিভাকে চ্যালেঞ্জ জানাবার মত ক্ষমতা ধরত একজন, প্রেসটনের টম ফিনি। এই দুজনকে নিয়ে ইংল্যাণ্ড ফুটবলার নির্বাচক মণ্ডলীও ভাবনায় পড়ে কাকে রেখে কাকে খেলাই। কখনো দেখা গেছে ফিনি হচ্ছে ম্যাথুজের সতীর্থ কখনোবা ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী।

ম্যাথুজের দীর্ঘ ফুটবল জীবনের পশ্চাৎপটও চলচ্চিত্রের কায়দায় গতিশীল ও বৈচিত্রময় এবং একটা ফুটবলারের জীবনে এত পরিবর্তন আশা করাও দুরূহ।

১৯৩৮এ ম্যাথুজ চেয়েছে স্টোক সিটি ছেড়ে সে অন্যত্র চলে যাবে। এই শুনে স্টোকের বাসিন্দারা একযোগে সোচ্চার হয়ে উঠল—'ম্যাথুজের যাওয়া হবে না।' সত্যিই ম্যাথুজ তখনকার মত নিজের ইচ্ছার লাটাই গুটিয়ে নিয়েছে। তবে বাড়ির ও ব্যবসায়ের দুই কাজে জড়িয়ে পড়ে ম্যাথুজ স্টোক সিটি ছেড়েছে সাতচল্লিশ সালে। ম্যাথুজের তখন যা বয়স তাতে তাকে ফুটবল মাঠের প্রবীণ বলা চলে, তাহলেও ও নিজস্ব ফুটবল ক্ষমতা তখনো ছিল অটুট।

আটচল্লিশে এফ. এ. কাপ ফাইনালে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কাছে ব্ল্যাকপুল হারে ২-৪ গোলে। তিন বছর বাদেও ব্ল্যাকপুল ওই ফাইনাল খেলায় হেরেছে নিউ ক্যাসল ইউনাইটেডের কাছে ছু গোলে। কিন্তু আমি যে ম্যাচটির কথায় আসতে চাইছি সেটা হল ১৯৫৩র এফ-এ. কাপ ফাইনাল।

খেলা হয়েছিল বোল্টনের সঙ্গে ব্ল্যাকপুলের। সেই বহু বছর বাদে বোল্টন ওয়াণ্ডারার্স ফাইনালে ওঠায় অনেকেই স্মৃতির ঝাপসা চোখ কচলাতে শুরু করেছেন। তবে লফট হাউসের মত খ্যাতিমান খেলোয়াড়টি ছিল বোল্টনের আশা ভরসা। তারই আগের বছর (৫২ তে) লফট হাউসকে দেওয়া হয়েছিল বছরের সেরা ফুটবলারের সম্মান। তাই সকলে আশা করেছে ১৯৫৩-র 'কাপ ফাইনাল' লফট হাউসের নামেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু বিধি হল বাম।

খেলার সূচনাতেই লফট হাউস গোল করেছে। তবে কিছুক্ষণ বাদেই মর্টেনসন গোল শোধ দেওয়ায় ব্ল্যাকপুল সমর্থকরা আবার চেগে উঠল্ কিন্তু সে আর কতক্ষণ। হাফটাইমের আগে পরে ছুটি গোল করে বোল্টন এতটা এগিয়ে গেল যে সবাই জেনে গেছে—ব্ল্যাকপুল পরাজিত। একমাত্র ব্ল্যাকপুলের খেলোয়াড়রা ছাড়া। যখন এমনি অবস্থা—ম্যাথুজের কাছ থেকে একটি পাশ পেয়ে মর্টেনসন বোল্টনের একজন ডিফেণ্ডারকে ফাঁকি দিয়েই গোল করল—ফলাফল চলেছে ৩-২। সারা মাঠে ম্যাথুজ, সীজারের দাম্ভিকতায় খেলে যাচ্ছে—আবার ফ্রি কিক থেকে মর্টেনসনের গোল! সমান অবস্থা ৩-৩। বাকি রইল আহত হওয়ায় খরচ হওয়া বাড়তি সময়টুকু। বলটি ম্যাথুজের পা থেকে আউট সাইড লেফট পেরির কাছে গেল—এবং গোল! ম্যাচটি চিহ্নিত রইল 'ম্যাথুজ ফাইনাল' এই আখ্যায়। যদিও ম্যাথুজ নিজে ওই ম্যাচটিতে একটিও গোল করেননি।

এরপরেও ফুটবলারদের গূঢ় রহস্যরূপে ম্যাথুজ তার ফুটবল জীবন চালিয়েছে। তার সঙ্গে থেকেছে মাঠের বাইরে চির পরিচিত লাজুক, গম্ভীর, আপনভোলা, প্রশান্ত ম্যাথুজ। জীবন প্রান্তে এসে ম্যাথুজ অবসর নিয়েছে। তার আগে আবার ফিরেছে স্টোক সিটিতে। কে জানে হয়তো পুবোনো ঋণ শোধের তাগিদ। ম্যাথুজেব সজীবতায় স্টোক সিটি উঠেছে প্রথম ডিভিসনে। চূড়ান্ত অবসরেব কিছুদিন বাদে ব্রিটিশ সরকার ছেষট্টিতে সর্বপ্রথম পেশাদার ফুটবলাব স্ট্যানলি ম্যাথুজকে 'নাইট' উপাধি দিয়েছিলেন।

বিশ্বের ফুটবলাব মিছিলে ম্যাথুজ এক অনবদ্য চরিত্র। তাব প্রতি আধুনিক ফুটবলাররাও কতটা সম্মান জানাতে চায় তাব জোরালো উদাহরণ—পঁয়ষট্টিতে ম্যাথুজ তাঁর শেষ ম্যাচটি খেলে যখন ফিরছিলেন তখন ইয়াসিন ও পুসকাস ওকে কাঁধে তুলে নেন। এর কয়েকমাস আগে ম্যাথুজ বয়সের দিকে পঞ্চাশের কোটা পেবিয়েছেন, এইমাত্র। পেশাদারী ফুটবলারের তেত্রিশটা বছরও উনি তখন শেষ করেছেন। ইংল্যাণ্ডের হয়ে আন্তর্জাতিক খেলায় ৫৪টি ম্যাচের অভিজ্ঞতাও তখন ওর মুঠোর মধ্যে। প্রসঙ্গত ওই আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে আরম্ভ করেছিলেন উনিশ বছর বয়সে, শেষ করেছেন বিয়াল্লিশে। আর্জেন্টিনা থেকে জাম্বিয়া সব জায়গায়ই ম্যাথুজ নামটা সকলের পরিচিত। আর ওই জাম্বিয়াতেই ম্যাথুজ 'ফুটবলেব বাজা' উপাধিটি পেয়েছিলেন। তবে ইংল্যাণ্ড ফুটবল নির্বাচকদেব বেআক্কেলি ব্যবহারের কথা ভেবে বাধ্য হয়েই একটু অবাক হই। ছাপান্নোতে, ব্রাজিলের তরুণ ফুটবলারদের সঙ্গে সমানে যোঝাব জন্যে ইংল্যাণ্ড নির্বাচকেরা ম্যাথুজকেও দলভুক্ত করেছিল। বোধহয় কেন, নিশ্চিত ভাবেই তারা ঠিক কাজই করেছে। ম্যাথুজের মত অমিত বিক্রম রাইট উইঙ্গার ইংল্যাণ্ডের মাঠে দেখা যায়নি। তাই একচল্লিশ বছর বয়সেও সর্বগুণসম্পন্ন ফুলব্যাকদের ঠকানোয় ম্যাথুজ ছিল সমান পোক্ত। শুধু এক আধজনকে নয় সমস্ত ডিফেন্সকে তছনছ করে গোল করে আসার ক্ষমতায় ম্যাথুজ তখনো টগবগ করত।

পেলেই ফুটবল

আটান্নো সালে বিশ্বকাপ চলাকালীন ধূমকেতুর মত উদয় হল একটি ফুটবলারের নাম। খবর কাগজের খেলার পাতার শিরোনামে ওই নামটি বারবার উঠেছে। ব্রাজিল দলের সঙ্গে এই ছেলেটিও খেলতে নেমেছিল সুইডেনের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায়। ছেলেটি বলছি, কারণ এডসন অ্যারান্টোস ডো ন্যাসিমেন্টো ওরফে পেলের তখন বয়স মাত্র আঠারো। টিম হিসাবে ব্রাজিল ওই প্রতিযোগিতায় জুল রিমে কাপ জয় করেছিল অপর দিকে উপস্থিত সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আক্রমণাত্মত ফুটবলার হিসাবে পেলে পেয়েছে অভাবনীয় প্রশংসা।

ওয়েলসের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে পেলে যে গোলটি করেছিল বোধহয় সেটিই তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তারপর থেকে পেলের কাছে ফুটবল জগৎ হয়ে উঠেছে জলেব মত সহজ। ফলপরিণতিতে নিজের কৃতিত্বে সে এতটা প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে ওই অনুষ্ঠানের ফাইনালেও দুটো গোলও করে। এইভাবে পেলে নামটি ফুটবল ইতিহাসের পাতায় নিজের জায়গা করেছে চিরস্থায়ী।

ওয়ার্ল্ড কাপ টুর্নামেন্ট সুরুর আগেই পেলেকে সবাই মেনে নিয়েছে বিশ্বের সেরা ফুটবলার রূপে। এই মুকুটহীন সম্রাট তার পরে প্রতি বছরেই এই সম্মানটি বাঁচিয়ে রেখেছে —নিরলস দক্ষতা দেখিয়ে। পাশাপাশি পেলে লাখপতি হয়েছে। রাস্তার নাম দেওয়া হয়েছে পেলে ষ্ট্রীট। মিনারের ক্ষেত্রে ওই সুপরিচিত ফুটবলারের নামটি বাদ দেওয়া হয়নি—সবই পেলের খ্যাতির স্বীকৃতি। বিশ্বকাপ খেলায় চোট পেলেও ওর সুখ্যাতিতে একটুও আঁচড় লাগেনি।

চিলিতে বিশ্ব কাপ খেলা শেষে পেলে তার নিজের স্যান্টোস ফুটবল ক্লাবের হয়ে ইউরোপে ওয়ার্ল্ড ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ,

খেলতে যায়। এখানে পেলের সুনাম এত হু হু করে বাড়ে যে ফুটবল সমর্থকরা ফুটবল বলতে পেলে ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রসঙ্গে ফিরতে চায়নি। সেই থেকেই সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছে পেলের নাম।

আজ পর্যন্ত হামেশা দেখা যায় প্রশংসা খেলোয়াড়কে ডুবোচ্ছে। কিন্তু পেলের ক্ষেত্রে এমন ঘটেনি। অন্য সব খেলেয়াড়দের যে যার নিজের ট্যাকটিকস বা স্টাইল মেনে চলে কিন্তু পেলের ফুটবল খেলায় সহস্র বৈচিত্র্যের সমাবেশ। একবার যে ভাবে সে নড়াচড়া করে সেটি তাকে আর দ্বিতীয়বার করতে দেখা যায়না। একই পথে দুবার ড্রিবলিং সে করে না এবং তার মধ্যে সব সময়েই অসম্ভব কিছু সাধন করার চেষ্টা চলে। বস্তুতঃ পেলে সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে তৈরি এক খাঁটি ফুটবলার। পরিস্থিতি অনুযায়ী আস্তে-জোরে দুরকম ফুটবল খেলতেই পেলে সক্ষম! পেলে তার প্রতিপক্ষের চেয়ে উঁচুতে উঠে হেড করতে, দ্রুত ছুটে যেতে এবং বল কাড়াকাড়িতে অশেষ গুণবান। নিশানা মাপা জোরালো শট্‌ করায়ও পেলের জুড়ি পাওয়া যাবে না।

পেলের জন্ম হয়েছিল মাইনাস জেরেস প্রদেশের এক অখ্যাত পল্লীতে। খেলাও সুরু করেছিল স্বল্প পরিচিতি সম্পন্ন বউরু ওনভোস্তেতে। পেলেকে দেখে সেই সময়কার নামকরা ফুটবলার ওয়াণ্ডামারের খুবই চোখে লাগে। তিনিই পরে পেলেকে উৎসাহিত করেন। খুব বাচ্চা বয়সেই পেলে ব্রাজিলে প্রচুর ফুটবল ম্যাচ খেলেছে। ওয়াণ্ডেমারে জোর গলায় সকলকে বলেন, তিনি এমন একজন ফুটবলারকে খেলা শেখাচ্ছেন যে ভবিষ্যতে ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাসে এক বিখ্যাত খেলোয়াড় হয়ে উঠবে। সত্যিই পেলে যখন বড় আসরে নেমেছে তখনি বিশ্ব ফুটবল ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটে।

খ্যাতির প্রসাধন গায়ে মেখেও মাসে ১৮ হাজার টাকার উপায়ী পেলে তার জীবনযাত্রায় কোন বাড়তি জাঁকজমক পছন্দ করেনি। সে তার বাবার কাছেও যেমন সুবোধ বালক তেমনি জীবনযাপন সম্বন্ধেও অতি

সতর্ক। ইউরোপীয়ান ক্লাবের তরফে পেলেকে মোটা টাকার বিনিময়ে পাওয়ার জন্মে স্যাণ্টোস ক্লাবকে অনুরোধ জানানো হলেও পেলে স্যাণ্টোস ছাড়েনি। একবার ইতিালির একটি ক্লাব ২১ লক্ষ টাকার বদলে পেলেকে পেতে চেয়েছিল এবং তারা ওয়ার্ল্ড কাপে পেলেকে ব্রাজিলের হয়ে খেলতে অনুমতি দেবে এ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল—পেলে কিন্তু তার প্রতিশ্রুতি হতে একচুলও সরে বসেনি। পঁয়ষট্টিতে অ্যালজিয়ার্সের একটি ক্লাব এক জাহাজ বোঝাই পেট্রোল, ফসফেট, কয়লা ও তরল গ্যাসের বিনিময়ে পেলেকে চেয়েছে—পেলে তবুও অসম্মতিতে অটল।

ফুটবল থেকে রোজগার ছাড়াও বাচ্চাদের টনিকে পেলের নামে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ব্রাজিল সরকারের সঙ্গে তার চুক্তি হয়েছে যে তার নাম কফির বিজ্ঞাপনেও ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু অন্য ব্যবসায়িক সংস্থা পেলের কাছে তার নাম বিজ্ঞাপনে ব্যবহারের জন্য প্রস্তাব দিলেও তাদের মধ্যে ধূমপান ও মদের ব্যবসায়ীরা সন্তুষ্ট হতে পারেনি—কারণ পেলে তাদের বিজ্ঞাপনে নিজের নাম ব্যবহার করাতে অনিচ্ছুক হয়। এর উনিশে নভেম্বর বিশ্বের ওই ফুটবল সম্রাট তার পেশাদারী জীবনের সহস্রতম গোলটি করেছে, উনত্রিশ বছর পেলের এই নিদর্শন হয়তো অনেকদিন ধরে অক্ষুন্ন থাকবে। এই হাজার গোলের স্মরণে স্যাণ্টোস সিটির এক ক্রীড়াসাংবাদিক তার প্রথম গোলটিকেও স্মরণ করছে। পেলে ওই গোলটি করেছিল ১৯৫৬ সালের সাতই সেপ্টেম্বর। খেলাটি ছিল স্যাণ্টোসের সঙ্গে স্যাণ্টোস অ্যান্দ্রের করিনথিয়ান্স দলের। পেলে তার প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগের ভিতর দিয়ে পথ তৈরি করে নিয়ে ঢুকে বলটি গলিয়ে দিয়েছিল গোলকীপার জালুয়ার পায়ের ফাঁক দিয়ে। এই খেলায় স্যাণ্টোস জিতেছিল ৭-১ গোলে।

তবে পেলের হাজার গোলটি করার আগে মারাকানাতে ভাস্কো ডা গামা স্টেডিয়ামের খেলায়, নশো আটানব্বইতম গোলে পৌঁছায়।

উপস্থিত পঁচাত্তর হাজার দর্শকের চিৎকারের চোটে স্টেডিয়াম গম গম করছিল। সারা স্টেডিয়ামে জুড়ে চলেছে উৎসবের আনন্দ।

পরের খেলার সূচনাতেই পেলে তার নশো নিরানব্বইতম গোলটি করে। মনে হয়েছে খেলা শেষের বাঁশি বেজে যাবে পেলে হয়তো হাজারতম গোলটি করতে পারবে না। বিরোধী দলের রক্ষণভাগের একটি প্লেয়ার পেলেকে ফাউল করে—পেলে পেনাল্টির সুযোগ পায়। পেনাল্টি শট্ নেওয়ায় তিন মিনিট দেরি হয়েছে। চারিদিকেই জবর চিৎকার—পেলে কিক করবেই। যেই কিক নিয়ে পেলে গোলটি করছে সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার দর্শক, ফটোগ্রাফার ও সাংবাদিকের ভিড়ে পেলে অন্তর্হিত হয়, নৌবাহিনীর ব্যাণ্ডে ব্রাজিলের জাতীয় সঙ্গীতের তালে তালে রাজা পেলের নামটা শোনা গেল। জলভরা চোখে পতাকা উত্তোলন করল সে নিজেই। অনুষ্ঠানটি মনে রাখার জন্যে চেষ্টায় কসুর ছিল না। ডাক টিকিটও ছাপা হয়েছে ওর নামে।

"এযাবৎ আমার জীবন কাহিনীতে আজ রাত্রেই আমি ভীষণ অভিভূত হয়ে পড়েছি!" এই কথাটির সঙ্গে পেলে আরো যোগ দেয়— "মেক্সিকোর ওয়ার্ল্ড কাপ অনুষ্ঠানে আগের চেয়ে আরো ভাল খেলতে পারব এই রকম মনের জোর ফিরে পেয়েছি।"

ছেষট্টির বিশ্ব কাপে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের কাছে মার খেতে খেতে পেলের হয়েছিল চরম শিক্ষা। দুঃখ করে বলে, সে আর বড় ফুটবল খেলার ঝুঁকি নেবে না। বিশ্বকাপ ফাইনালের আগেই সে অবসর নেবে।

এতে পেলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসায়ে খুইয়েছে দেড় লাখ ডলারের মত। আর্থিক দিকে জোড়া তালি দেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

টাকাপয়সার ব্যাপারে এতটা ঝুঁকি নিয়ে পেলে তার জীবনযাপন সমানভাবে বজায় রেখেছে। সে বিয়ে করেছে রোজমোর নামে এক স্কুল

শিক্ষয়িত্রীকে। রাজনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠির লোকেরাও পেলের কাছে প্রায়ই দরবার করে। তারা ভাবে, পেলে কৃষ্ণ সম্প্রদায়ের এক বিরাট মুখপাত্র।

ওদের মতামতে সায় না দিয়ে পেলে বলে, আমি নিগ্রো হলেও যেহেতু আমি ফুটবল স্টার, সেজন্য ওরা আমার কাছেও আসে।

সৎ ও সংযত পেলে বাক চাটুকারিতাকে তেমন আমল দেয় না। তার পছন্দের তালিকায় আছে সিনেমা দেখা ও ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার গান। এই সমস্ত জড়িয়ে পেলেকে এখন আর কেউ ধূমকেতু বলবে না—এখন সে পৃথিবীর ফুটবল নাটকের মর্যাদা-মণ্ডিত নায়ক।

পুরনো কথায় আবার ফিরছি। সত্তরে বিশ্ব কাপ ফুটবলে পেলে অন্যবারের মত বিস্তৃত প্রাধান্য বলে ব্রাজিলকে চিরতরে জুল রিমে পাইয়েছে। টিম হিসাবে ব্রাজিল সেরা এবং একক বৈশিষ্ট্যে পেলে শ্রেষ্ঠ, একথাটাই সত্তরের ওয়ার্ল্ড কাপের সঠিক সারমর্ম। পেলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে—একথা বলাই বাহুল্য। তবে আগেই পেলে ঘোষণা করেছিল ব্রাজিল সত্তরে সফল বা বিফল যাইহোক এইবারই শেষ, আর ম্যুনিখের ওয়ার্ল্ড কাপে আমি খেলব না।

এতে কতকগুলো নঞর্থক কথা এসে যায়—ফুটবলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্লেয়ার আর দর্শকদের অফুরন্ত আনন্দ দিতে মাঠে নামবে না। দু পায়ে সেই তীক্ষ্ণ এবং শনৈ গতির স্যুটিং অব্যর্থ ভাবে গোলমুখী হবে না।

পেলে তার বাধাদানকারীকে হঠাৎ জব্দ করার জন্যে তার হাঁটুর নিচে পায়ে নলিতে বল মারার ধূর্তামিতে আর কখনো মাতবে না।

এতে হয়তো পৃথিবীব্যাপী পেলের সাপোর্টার সমুদ্রের কিছু অংশ শান্ত হবে। কে জানে ওদের ভিতর হয়তো কেউ 'শেষ অনুরোধ' শিরোনাম দিয়ে চিঠি লিখবে।

মহামান্য এডসন অ্যারাণ্টোস ডো নাসিমেন্টো—আপনি বাকি কয়েকটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে ফুটবলারের চির আকাঙ্খিত সম্মান 'ডাবল' লাভ করুন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে হাজার গোলতো করেছেনই —একশোটি ম্যাচ খেলে খেলা ছাড়লে ক্ষতি কি।

———

সম্পূর্ণ ফুটবলার স্টেফানো

ব্যাপারটা আমার কাছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখার মত লাগে। ধরুন এক বিশ্ববিখ্যাত ফুটবলার কিছুদিন আগে তার মাঠের জীবন শেষ কবেছে। অতীব সাধুতা কবে সে ঠিক করল, জীবনভোর যে ফুটবল খেলা সে খেলেছে তাতে আদৌ কোন খাদ ছিল কিনা সেটা মেপে দেখতে হবে। পাশাপাশি তুলনামূলক বিচারে তার সমকক্ষ খেলোয়াড়দের গুণাবলীও সে সাজাতে কসুর করেনি। নিরপেক্ষ ভাবে বহুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে অবশেষে সে নির্মম সত্যে পৌঁছয়—তার খেলাতেও অনেক জায়গায় ত্রুটির অভাব ছিল না। সমাধান পেল—যে যাই বলুক সে বিরাট নাম যশ পেয়েও সারা জীবনেও সম্পূর্ণ ফুটবলার হতে পারেনি। এর চেয়ে আর দুঃখের কথা কি হতে পারে।

এমন ঘটনা বহু ফুটবলারের জীবনেই ঘটেছে ও ঘটবে। কিন্তু একজন ফুটবলারকে সম্ভবতঃ এই ধরনের দুঃখ ভোগ করতে হবেনা। চোখ বুঁজে বলা চলে পৃথিবীর সব মাঠেই কমপ্লিট ফুটবলারের সুনাম নিয়ে প্রায় ডঙ্কা বাজিয়ে খেলেছে আর্জেন্টিনীয় সন্তান অ্যালফ্রেডো ডি স্টেফানো। স্টেফানো নিজের খেলার গমকে এমনি একটা পশ্চাৎপট রেখে গেছে, যাতে সে প্রৌঢ়ত্বেও দাবি করতে পারে—"আমি আমার সময়ে ছিলাম একটি পুরো ফুটবলার।"

এতবড় ঔদ্ধত্য নিয়ে যে ফুটবলার কথা বলতে পারে তার পেশাদারী

ফুটবল জীবনের সুরু হয়েছিল মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে। আর মাত্র বাইশ বছর বয়সের সময় স্টেফানো আটটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে ফেলেছে। এর পরে অ্যালফ্রেডোকে আর্জেন্টিনার মাঠে আর দেখা গেল না। দেখা গেল কলম্বিয়ার মাঠে।

এতে কলম্বিয়া মাঠের দর্শকরা আফশোষ করতে পার, আমরা তো অ্যালফ্রেডোকে মাত্র বছর পাঁচেক দেখেছি। কথাটা অমূলক নয়। এই যাযাবর ফুটবলারটি পাঁচ বছরের মায়া কাটিয়ে কলম্বিয়ার মাঠ থেকে সোজা হাজির হয়েছে স্পেনে। স্পেনের রিয়েল মাদ্রিদ ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি পাতিয়েছে মোটা টাকার বিনিময়ে। বারো বছর ধরে এই গাঁট ছড়া স্থায়ী হয়েছিল। লাভবান হয়েছে স্পেন ও ইউরোপের দর্শকরা। এই সর্বগুণসম্পন্ন ফরোয়ার্ডটি স্পেনের হয়ে ৩০ বার খেলতে নেমে গোল করেছে একত্রিশটি। যা কোন স্প্যানিশ ফুটবলারের কাছে স্বপ্নের সামগ্রী। এছাড়াও রিয়েল মাদ্রিদের হয়ে অ্যালফ্রেডো ৫৬৫টি ম্যাচে গোল করেছে ৪৬৬টি।

ওই ৫৬৫ টি ম্যাচের ফিল্ম তুলে রাখলে নিশ্চিত চোখে পড়ত ডি স্টেফানো ক্ষণে ক্ষণে নিজের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে অজস্র নতুন ফুটবল ফন্দির জন্ম দিচ্ছে। এর সঙ্গে ওর দেহ ও মনের মধ্যে চলেছে সূক্ষ্ম অথচ নির্ভুল বোঝাপড়ার কাজ।

অ্যালফ্রেডোর ফুটবলার জীবনের প্রথম অধ্যায়ে দর্শকরা ওর ক্ষিপ্রতা, সর্তক ভঙ্গি দেখে নাম দিয়েছিল 'সোনালী তীর'। আবার অ্যালফ্রেডো একচল্লিশে প্রৌঢ়ত্বের সদর দরজা পৌঁছে যখন ফুটবলার তৈরি করার কাজে ব্যস্ত তখন ওর শক্ত চোয়াল, টোল পড়া থুতনি, ধারালো নাক, প্রশস্ত কপালের চেয়ে স্বল্প কেশ মাথাটার দিকেই দর্শকরা নজর দিয়ে নামকরণ করেছে 'দ্য ডিভাইন ব্যল্ড ওয়ান'।

সামান্য একটি অনুরোধ—যেহেতু স্টেফানো পুরোভাগে খেলে এবং পুরোপুরি ফুটবলার, সেজন্যে কেউ ভেবে বসবেন না যেন স্টেফানো শুধু গোল তৈরি করার মানব যন্ত্রবিশেষ।

স্টেফানোকে যারা মাঠে মন দিয়ে লক্ষ্য করেছে তারা এ ভুলটি কখোনই করবে না। কারণ মাঝ মাঠে ওর বিক্রম অপ্রতিরোধ্য। মাঠের কেন্দ্রস্থলে সেন্টার সার্কেলের পাশে থাকার সময় একটি পরিচিত দৃশ্য প্রায়ই ভেসে উঠত। স্টেফানোর পা থেকে মাপা পাশগুলো এমন জায়াগায় যাচ্ছে যেটা প্রতিপক্ষের ডিফেণ্ডাররা চোখের সামনে দেখেও বুঝতে পারছে, কত বড় বিপর্যয় হতে চলেছে। ওদের নির্বুদ্ধিতার সুযোগ নিয়ে স্টেফানো বিপক্ষ ব্যূহে ফাঁক সৃষ্টিতে মত্ত। একটু ঢিলেমি দিলেই স্টেফানো তার চাপের ধাক্কায় প্রতিপক্ষকে কোণ ঠাসা করে ফেলে। এই শাস্তি দেওয়ার কাজে ওর শশব্যস্ততায় এত গতি থাকে যে স্টেফানোকে ঠাওর করা সহজ কথা নয়।

———

ফুটবল সেনাপতি পুসকাস

হাঙ্গেরির ফুটবলার ফেরেঙ্ক পুসকাসের জীবনীতে চোখ রাখতে গিয়ে বার বার পড়তে হয়েছে ডজন ডজন গোলের গপ্পোর সামনে। সেগুলো যেন ক্রমশই একটা সারবান সারমর্মের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে দেয়, মেজর পুসকাস ফরোয়ার্ডের ভূমিকায় শুধু গোলের মালা গাঁথা কাজটাই প্রধানতম দায়িত্ব বলে নিয়েছিলেন।

উদাহরণতঃ হাঙ্গেরির পক্ষে আন্তর্জাতিক ম্যাচে পুসকাল গোল করেছিলেন তিরাশিটি। কিসপেস্ত অ্যাথলেটিক ক্লাব ও বুদাপেস্টের হনভেদের পক্ষে ফেরেঙ্ক গোল দিয়েছিল এক হাজারেরও বেশি। ১৫০টি গোল করেছেন স্পেনে থাকাকলীন ওখানকার লীগের খেলায়। ওইসব দৃষ্টান্তের পাশে ইউরোপীয়ান কাপে পুসকাস কৃত ২৯টি গোলের উদাহরণ আরও উজ্জ্বল।

পুসকাসের বয়স বাড়তেই তার টগবগে ভাবটা একটু মোড়

নিয়েছে। ক্ষিপ্র হওয়ার চেয়ে সব সময়েই পুসকাস চেয়েছে একটু অনুভূতির উপর আস্থা রেখে চলতে। এসময়ে কার্যকারিতার জন্যে ওকে 'বল আর্টিস্ট' এর শিরোপা দেওয়াটাই উচিত হবে।

প্রতিপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে একটু ফাঁক ফোঁকরের সৃষ্টি হতেই পুসকাসের বাঁ পা'টা শট করার তাগিদে অস্থির হয়ে উঠত। জোর কদমে পা ফেলার প্রশংসায় লোকে বলত—দি গ্যালপিং মেজর এবং বাঁ পায়ের ছটফটানির কথা ওকে বললে পুসকাস উত্তর দিয়েছে, "ডান পা'কে শুধু দেহের ভার ঠিক রাখার কাজেই ব্যবহার করি।" যাহোক ওর বাঁ পা এমন মারাত্মক ভাবে কাজ করত যে অনেকের ডান পাও অত ভাল চলত না। এই হল ওর ছেলেবেলার ফুটবল ঢং।

পুসকাসের সাত বছরের বেলায় বুদাপেস্টের রাস্তায় অন্য ছেলেদের সঙ্গে ওকেও ফুটবল খেলতে দেখা গেছে। ফুটবলটি ছিল ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়ানো একটি পুঁটলি। খেলার জায়গার কোন বাছবিচার ছিল না। এইভাবে পুসকাসের ফুটবল জ্ঞান অতি দ্রুত পেকে উঠলেও কিসপেস্ট অ্যাথলীট ক্লাব ওর দশ বছর বয়সের সময় ভরসা করে দলে নিতে পারেনি। ওদের মাপকাঠিতে পুসকাস ছিল সামান্য শিশুমাত্র। এতে পুসকাসের, ফুটবল কোচ (ওর বাবার) জিদ বেড়ে যায়। উনি কিসপেস্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটা আবার ভেবে দেখতে বলেন। শেষে কিসপেস্ট ক্লাব মত না পাল্টে থাকতে পারে না।

প্রসঙ্গটি আবার বলার প্রয়োজন এজন্যেই যে কিসপেস্ট ক্লাবের এই প্রাথমিক সাফ জবাবে পুসকাস এত হতাশ ও বীতশ্রদ্ধ হয়েছিল, সে প্রায় ফুটবল খেলা ছেড়েই দিত। শুধু নিজেকে সামলে নিল ওর বাবার স্বতোপ্রণোদিত চেষ্টার জন্যে। যাহোক পুসকাস জড়িয়ে পড়ল কিসপেস্ট ক্লাবের সঙ্গে। অনুশীলন করতে করতে শেষে লীগ খেলার প্রথম সুযোগ পেল মাত্র সতের বছর বয়সে।

দুর্ভাগ্য, পুসকাস খেলতে নেমেও তার দলের ০—৩ গোলের পরাজয় রোধ করতে পারল না। কিন্তু ওই একটি খেলাতেই সে কাজ গুছিয়ে নিয়েছে।

হাঙ্গেরি টিমে পুসকাস পুরোপুরি খেলার অধিকার পায় পঁয়তাল্লিশ সালে। এই সময়কেই বলা হয় হাঙ্গেরি ফুটবলের ঊষাকাল। উনপঞ্চাশেই কোজিস, গ্রসিকস, বোজিক ও হিদেকুটির মত বিখ্যাত ফুটবলারদের নতুন মুখ ভেসে ওঠে। পরে ওরাই খেলেছে হাঙ্গেরির জাতীয় দলে ওস্তাদ সিবেসের পরিচালনায়। হাঙ্গেরি ওই বছর পোল্যাণ্ডকে হারায় ৮—২ গোলে। উপর্যুপরি ছত্রিশটি খেলার মধ্যে পুসকাসের এটিই ছিল প্রথম খেলা।

একান্ন থেকে পঞ্চান্ন'র মধ্যেই পুসকাস বেশিবার হাঙ্গেরি টিমে খেলেছে। হাঙ্গেরির সামরিক বাহিনীর এই মেজরই জাতীয় ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন পদে মনোনয়ন পায়। ওই ক'বছরের মধ্যে পুসকাস তার ক্লাবকে লীগ বিজয়ে সাহায্য করে পাঁচবার। সে হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে হাঙ্গেরিকে সোনার মেডেল পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে, এবং ইংল্যাণ্ড নিজের মাটিতে প্রথম শোচনীয়ভাবে যে বিদেশী দলটির কাছে হেরেছিল পুসকাস ছিল সে দলের অধিনায়ক। এই টানা পাঁচ বছরে সাতচল্লিশটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে পুসকাস অধিনায়কত্ব করে। এর মধ্যে হাঙ্গেরি জিতেছিল চল্লিশটিতে। এছাড়া ড্র করেছিল ছ'টি খেলায়। হেরেছিল মাত্র একবার। এমনি বরাত খারাপ যে ওই হারটি ছিল বিশ্ব কাপের ফাইনালে।

১৯৫৬-র চৌদ্দ অক্টোবরের পরেই পুসকাসের এই ঝকঝকে প্রতিভায় ছায়া পড়ে। পুসকাস তার শেষ খেলাটি খেলতে নামে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে। এই খেলায় ও করেছিল মাত্র একটি গোল। এটাই তার চুরাশিতম আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ।

সাতান্নর জানুয়ারিতে হাঙ্গেরি এক দলের হয়ে ব্রাজিলের বেসরকারী সফর সেরে ফিরতেই পুসকাসের টিমটি তছনছ হয়ে যায়।

পুসকাস তার স্ত্রী ও শিশু কন্যা নিয়ে ভিয়েনাতেই কিছুদিনের জন্য কাটাতে মনস্থ করে। এমতাবস্থায় ওকে চাকুরি দেওয়ার জন্যে মিলান, ইণ্টার ন্যাপোলি, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানি ও ফরাসী দেশ থেকে বিশেষ গরজ দেখানো সত্ত্বেও পুসকাস স্পেনের রিয়েল মাদ্রিদ ক্লাবে যোগ দেয়। ফলে হাঙ্গেরিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন থেকে আবেদন পেয়ে ফিফা পুসকাসকে ১৮ মাসের জন্য বরখাস্ত করে। এই শাস্তি কালের শেষে ১৫ই আগস্ট, ১৯৫৮ সাল থেকে সুরু হয় পুসকাসের দ্বিতীয় জীবন।

স্প্যানিশ লীগের প্রথম বছরেই পুসকাস কোপা ও ডি স্টেফানোর সঙ্গে এক তালে পা ফেলেছে। যদিও তার শরীর একটু ভারি হয়ে গিয়েছিল তবু ২৫টি খেলায় মোট ২১টি গোল করে দ্বিতীয় স্থান পায়। সেই থেকেই পুসকাসের গোলের হার ছিল নিচেব হিসাব মত।

১৯৫৯-৬০—২৬টি গোল (টপ স্কোরার) '৬০-৬১,—২৭টি গোল (টপ স্কোরার) ৬১-৬২ —২০টি গোল (দ্বিতীয়) ৬২-৬৩ তে—২৬টি গোল (টপ স্কোরার) '৬৩-৬৪—২০টি গোল (টপ স্কোরার)।

এই অঙ্কের ক্রমান্বয় তালিকাটি একটি সিদ্ধান্তে দাঁড় করিয়ে দেয় পুসকাস এতাবৎকালের ফুটবলারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্কোরারদের অন্যতম।

রিয়েল মাদ্রিদ টিমে নিজেকে মানিয়ে নিতে পুসকাসকে কি কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে সেই আসল কথাটাই ওই সংখ্যাগুলি বলে দিতে পারবে না। একমাত্র পুসকাসের মত গ্রেট ফুটবলারের পক্ষেই নিজের আজন্ম অর্জিত ফুটবল জ্ঞানকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে ওই ধরনের ফুটবল রীতিতে মিশে যাওয়া সম্ভব।

পুসকাস এজন্যে তার ফুটবল স্টাইল বদলাতে প্রায় নিঃসঙ্গ ভাবে অমানুষিক খেটেছে দুবছর ধরে। শেষে দেহের ওজন কমিয়ে হয়ে উঠেছে উপযোগী ফুটবলার। হাঙ্গেরি থেকে স্পেনে পা দেওয়ায় অগত্যা পুসকাস তার বন্ধু কুবালার কাছে ধার করে টাকা এনেছিল। কিন্তু কিছুদিন বাদে

পুসকাস রীতিমত ধনী হয়ে উঠেছে। ওর মাদ্রিদে একটি ফ্ল্যাট আছে, আর আছে আচার তৈরীর একটি কারখানা। যেখানে পুসকাসেব অধীনে পঞ্চাশ জন লোক বাস করে। এছাড়া ও অ্যালিফান্টের সমুদ্রের ধারে পুসকাস একটি বাড়িও করেছে, এবং সে একটি হোটেলেব মালিক।

———

খেলোয়াড়চিত খেলোয়াড় ববি চার্ল্টন

ইংল্যাণ্ড টিম মেক্সিকোর ওয়ার্ল্ড কাপে হারলে ইংল্যাণ্ডের বহু সমর্থক যেমন দুঃখিত হয়েছেন তেমনি কিছুদিন বাদে এবটা জোব গুজবেও তারা আরও মুষড়ে পড়েছে। খবরটি ছিল ইংল্যাণ্ড টিমে সেই এগার নম্বর আঁটা জার্সি গায়ে পরিচিত প্লেয়ারটি বোধহয় আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে ছুটি নেবেন।

এই খেলোয়াড়টি হলেন ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন সেণ্টার ফরোয়ার্ড এবং '৬৬র ওয়ার্ল্ডকাপ' বিজয়ী ইংল্যাণ্ড দলের সেণ্টাব হাফ জ্যাক চার্লটনের ছোট ভাই ববি চার্ল্টন।

ববি জ্যাকের ছোট হলেও মেক্সিকোর মাঠে সে ছিল ইংল্যাণ্ড টিমে সবচেয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্লেয়ার। ওখানে শেষ খেলা পঃ জার্মানির বিরুদ্ধে খেলে ববি ফুটবল মাঠে রেকর্ডের রাজা বিলি রাইটের ১০৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার নজিরটি অতিক্রম করে যায়।

কিন্তু ওর অবসরের কথা শুনে ফুটবল সমর্থকরা কেন চোখের জল ফেলতে চাইল। এর একমাত্র উত্তর—ববির মত অমায়িক খেলোয়াড়চিত খেলোয়াড় ইংল্যাণ্ড কেন অন্য যে কোন দেশেও দুর্লভ।

কথাটা সাচ্চা না ঝুটা তা দেখতে মঙ্গলবার ২৭শে এপ্রিল'

তারিখে চার্ল´টনের খেলা শততম আন্তর্জাতিক ম্যাচটির মুখবন্ধ থেকে এগিয়ে চলুন।

ববির আন্তর্জাতিক খেলাকে সম্মান দেখাবার জন্য ওকেই সেদিন উঃ আয়ার্ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক করা হয়। যদিও এ সম্মান তিনি জানুয়ারিতে রুমানিয়ার বিরুদ্ধে খেলায় (এটি ছিল ওর ৯০তম খেলা) প্রথম অর্জন করেছিলেন। ওই মঙ্গলবার ওয়েমবলি স্টেডিয়ামে এক লক্ষ দর্শক জমায়েত হয়েছিল শুধুই ববি চার্ল´টনের জন্য। ববি যখনই বল ছুঁয়েছেন, এক লক্ষ কণ্ঠ সহর্ষে তাঁকে অভিনন্দিত করেছে। পরিস্থিতির উপযোগী অনবদ্য খেলাই তিনি খেলেছেন। ইংল্যাণ্ডের ৩—১ জয়ে তাঁর অবদান দুটি গোল।

ইংল্যাণ্ডের এফ এ এই ঘটনাকে স্মরণ করার জন্য ববিকে একটি রুপোর রেকাব দিয়েছেন তাতে ৩১টি দেশের পতাকা এনগ্রেভ করা। ববি এই কটি দেশের বিরুদ্ধেই ওই পর্যন্ত খেলেছেন। খেলা শেষে মাঠ ত্যাগের সময় দর্শকরা যখন আকাশ-ভাঙ্গা উল্লাসে ওঁকে অভিনন্দন জানাতে থাকে, ববি শুধু একবার পিছু ফিরে দুই হাত তুলে অভিবাদন জানিয়েই টানেলে ঢুকে যান।

স্যার আলফ র‍্যামজে বলেছেন এই খেলায় ইংল্যাণ্ড দল গঠনে তিনি সেনটিমেণ্ট দ্বারা মোটেই চালিত হননি। কিন্তু ববিকে তাঁর জীবনের এই অসাধারণ মুহূর্ত থেকে বঞ্চিত করতেও চাননি। দূর বিদেশের কোন মাঠে হলে এই স্মরণীয় ঘটনা একদমই হারিয়ে যেত।

ববি চার্ল´টনের খেলোয়াড় জীবনের যখন উদয় হচ্ছে, তখন স্ট্যানলি ম্যাথুজ এবং টম ফিনি অস্তাচলে। ম্যাথুজ ও ফিনির সঙ্গেই ফুটবলের একটা যুগেরও অবসান ঘটে। নতুন যুগে দেখা গেল খেলোয়াড় বেতনের সর্বোচ্চ সীমার বিলোপ, মাঠের ভিতরে ও বাইরে হিংসাত্মক আচরণের বৃদ্ধি, যে কোন ভাবে জয়ী হবার প্রয়োজনীয়তা যা কখনো কখনো পাগলামির পর্যায়েও পৌঁছে থাকে। ষাট থেকে সত্তর এই দশ বৎসর পৃথিবীর সব দেশেই এর সুফল ও কুফল সমান ভাবেই

দেখা গেছে। কিন্তু ববি চার্লটন বরাবরই নিজের কাছে খাঁটি রয়ে গেছেন। এই কঠিন, ঘূর্ণীপাকের দুনিয়ায় তিনি একটি অস্ত্রেই সব প্রতিকূলতার মোকাবিলা করেছেন, সেটি হল—বিশুদ্ধ দক্ষতা।

সেই দক্ষতা তাঁর প্রাপ্য পুরস্কার অর্জন করেছে। ববি চার্লটন ১৯৫৩-য় ম্যানচেষ্টার ইউনাইটেডের বালক দলে প্রথম যোগ দিয়ে কৈশোরেই সংগ্রহ করেন তিনটি এফ এ ইয়ূথ কাপ বিজয়ীর পদক। এরপর শুরু করেন, একজন ফুটবলারের যা কিছু সীমা তাই অর্জনের অভিযান। সিনিয়র দলে প্রথম খেললেন ১৯৫৬-র অক্টোবরে, সেই থেকে যা অর্জন করেছেন, বিশ্বের মাত্র কয়েকজন ফুটবলার তার অধিকারী। তিনটি লীগ চ্যামপিয়নশিপস এবং একটি করে এফ এ কাপ, ইওরোপীয় কাপ ও বিশ্ব কাপ জয়ীর পদক, ইংল্যাণ্ডের 'ফুটবলার অব দ্য ইয়ার' ও ইওরোপের 'ফুটবলার অব দ্য ইয়ার' পুরস্কার—এর উপর ১০০ আন্তর্জাতিক খেলা। তারও উপর খেলোয়াড়ী মনোভাবের অকলঙ্কিত খ্যাতি, যেটা বহু ফুটবলার কোনদিনই অর্জন করতে পারবে না।

৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮, বেলগ্রেডে ইওরোপীয় কাপের খেলা শেষ করে ফেরার পথে ম্যুনিখে বিমান দুর্ঘটনায় ধ্বংস হওয়া ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড দলটিতে ববি চার্লটনও ছিলেন। ফুটবলের ভাগ্য ও খেলাকে সমৃদ্ধবান করার জন্য তিনি বেঁচে যান। (এর দুই মাস পরই খেলেন তাঁর প্রথম আন্তর্জাতিক খেলা অকল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে)। বস্তুত তাঁর ফুটবল জীবন তিন ভূমিকার—প্রথানুগ ইনসাইড ফরোয়ার্ড, প্রথানুগ আউট সাইড লেফট এবং বহু নীচে নেমে থাকা সেনটার ফরোয়ার্ড।

১৯৫৮-৫৯ লীগ মরশুমে চার্লটন ৩৯তম খেলায় গোল দেন ইনসাইড লেফট হিসাবে। এরপরই তাঁর ভূমিকার বদল ঘটে এবং গোল সংগ্রহের সংখ্যাও কমে যায়। উনসত্তরের মরশুমে ক্লাবের পক্ষে তিনি মাত্র চারটি গোল করেন ২৫টি খেলায়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ববি চার্লটন-কৃত গোলের

জন্য ফুটবল-রসিকরা অপেক্ষা করতে রাজি। এঁর সম্পর্কে বলা হয়— চার্ল´টন গ্রেট গোল স্কোরার নন, কিন্তু স্কোরার অব গ্রেট গোলস।

জীবনের সেরা ম্যাচ কোনটি? এর উত্তরে ৩৩ বছর বয়সী, বিরল কেশ, পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি লম্বা, ১৬০ পাউণ্ড ওজনের ববি চার্ল´টন কিন্তু ছেষট্টির বিশ্বকাপ ফাইনালের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি। বলেছেন, মাদ্রিদে ইওরোপীয় কাপ সেমি-ফাইনালে রিয়েল মাদ্রিদের সঙ্গে ফিরতি খেলাটির কথা। ফলাফল ৩—৩ হওয়ায় ইউনাইটেড ফাইনালে ওঠে। জীবনপণ করে চার্ল´টন এ খেলা খেলেছিলেন। ফাইনালে বেনফিকার বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে বলেছিলেন 'বিশ্বকাপের ফাইনালের থেকেও আমার জীবনে এই ফাইনাল গুরুত্বপূর্ণ।' দশ বছর আগে এই প্রতিযোগিতায় খেলতে গিয়ে চার্ল´টন তাঁর বন্ধুদের হারান, নিজেও মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসেন। তাছাড়া বয়সও বাড়ছে, ইউরোপীয়ান কাপের ফাইনাল খেলার সুযোগ নেই। ওয়েম্বলিতে অতিরিক্ত সময়ে হারে ১—৪ গোলে। প্রথম ও শেষ গোল ছিল ববি চার্ল´টনের।

ববি চার্ল´টন জীবনে অনেক কিছু পাওয়ার জন্য ফুটবলের কাছে কৃতজ্ঞ। যাঁরা ফুটবল ভালবাসেন তাঁরা কৃতজ্ঞ ববি চার্ল´টনের কাছে। স্কট ফিটজারেলডের কথায় "বিউটিফুল ট্যালেনট" ওর আছে এবং তা আজও অম্লান।

বিশ্বকাপ
সত্তরের সেরা একাদশ

বিপদভঞ্জন ব্যাঙ্কস

বয়স বত্রিশ। উচ্চতা ৬ ফুট ১ ইঞ্চি। ওজন ৮৬ কেজি। ইংল্যাণ্ড টিমের কোন গোঁড়া সমর্থককে ওই মাপজোখের হিসাবটা দিয়ে যদি প্রশ্ন করা হয় এটি কোন ফুটবলারের হিসাব নিকাষ? সেকেণ্ডের মধ্যে সে জবাব রাখবে গোলকীপার গর্ডন ব্যাঙ্কসের।

এই ফুটবলারটি ইংল্যাণ্ডে এতই পরিচিতজন এবং ভালবাসার পাত্র যে মেক্সিকোয় কোয়ার্টার ফাইনালে পঃ জার্মানির সঙ্গে খেলার আগে যখন জানা যায় গর্ডন অসুস্থ, কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে পারবে না, তখন ইংল্যাণ্ডের সমর্থক মহলে প্রমাদ গোনা হয়—তবে হার নিশ্চিত।

দুর্ঘটনা কেউ ঠেকাতে পারেনি। ইংল্যাণ্ড হেরেছে। মেক্সিকোয় হেরে ইংল্যাণ্ড টিম ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরেছে। ব্যাঙ্কস ফিরেছে এক বিরাট সুনাম নিয়ে। বিশ্বের সেরা গোলকীপার হিসাবে সকলের মন জোগাতে পেরেছে। ব্যাঙ্কসের কপালে সুনাম জুটতে সুরু করেছে ছেষট্টির ওয়ার্ল্ড কাপ থেকেই। ইংল্যাণ্ডের ফাইনালে জেতা অবধি ব্যাঙ্কস গোল খেয়েছিল মাত্র তিনটি। এতে আবার ইউসেবিওর দেওয়া পেনাল্টি গোলটাও ধরা আছে। অষ্টম ওয়ার্ল্ড কাপে (ইংল্যাণ্ডে) ব্যাঙ্কসের নাম ডাক হু হু করে বাড়তেই ফুটবলের পেশাদারি মহলে ওর দরও চড় চড় করে উঁচুতে চড়ে। লিস্টার ওকে স্টোক সিটির হাতে তুলে দিয়ে পেয়েছে বাহান্ন হাজার পাউণ্ড।

ভাবতে অবাক লাগে কত কষ্টের সিঁড়ি বেয়ে এসে তবে ব্যাঙ্কসের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বেড়েছে। পুরনো দিনের স্মৃতিগুলো হাতড়াতে গিয়ে ব্যাঙ্কসের নিশ্চই মনে পড়ে তাকে এককালে রাজমিস্ত্রীর কাজও

করতে হয়েছিল। থাকতে হয়েছিল সামরিক বাহিনীর কড়া কানুনের আওতায়। এরই মধ্যে সে তার লক্ষ্যটিকে আঁকড়ে রেখেছিল ভাল গোলকীপার হতে হবে। তবে সেকি জানত ব্রিটেনের রাজকীয় খেতাব ও. বি. ই. ওর বরাতে জুটবে ওই ভালভাবে গোল আগলানোর জন্যে।

———

অনবদ্য ডিফেণ্ডার স্নেলিঞ্জার

ঘরের মাঠে ইংল্যাণ্ড ওয়ার্ল্ডকাপ জিতলে সমালোচকরা তাদের রক্ষণভাগের প্রশংসা করেছে সহস্র মুখে। জয়লাভের উত্তেজনাকে এক ধারে সরিয়ে সে সময় যাঁরা ইংল্যাণ্ডের ফরোয়ার্ড বাহিনীর কাছে তাদের সাফল্যের চাবি কাঠির খোঁজ নিচ্ছিলেন তাঁরা উত্তর পান যে ইল্যাণ্ডের ফরোয়ার্ডকে শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল পঃ জার্মানির রক্ষণমণ্ডলীর তিন রথী—হ্যালার, স্নেলিঞ্জার ও বেকেনবাওয়ের।

এই তিনজনের সমঝোতার বজ্র আঁটুনি খুলতে ইংল্যাণ্ড ফরোয়ার্ডরা বেশ কাবু হয়েছে। হার্স্ট ও ববি চার্লটনের মতে, ছেষট্টির ওয়ার্ল্ডকাপে ওই ধরণের শক্ত খুঁটির পাল্লায় ফাইনালের আগে কোন ম্যাচেই পড়তে হয়নি। এই রক্ষণ প্রাচীরে সরেস মদত দিয়েছেন কার্ল হিনৎস স্নেলিঞ্জারের অভাবনীয় দৃঢ়তা।

তবে সমস্ত কৃতিত্বটা পঃ জার্মানির কোচ হেলমুট শ্যোনের। তারই মাথা থেকে চিন্তাটি বেরিয়েছিল। এজন্য শ্যোনকে প্রচুর সমালোচনাও সহ্য করতে হয়েছে। এর প্রথম ঝাপটা আসে স্নেলিঞ্জারের উপর। ছেষট্টির ওয়ার্ল্ডকাপের প্রথম খেলায় সুইডেনের সঙ্গে ১-১ গোলে ফলাফল করায় জার্মান ফুটবল সার্পোটাররা একেবারে রেগে আগুন। এতে স্নেলিঞ্জার হঠাৎ বলে বসে, এই সব খেলায় পঃ জার্মানির জার্সি গায়ে দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। জার্মান টিমের সঙ্গে সে খাপ

খাইয়ে নিতে অপারগ। এই সব অনিচ্ছা সত্বেও সুইডেনের বিরূদ্ধে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারেও স্নেলিঞ্জার খেলেছে এবং পঃ জার্মানি জিতেছে ২-১ গোলে। এবারেও রক্ষণ ভাগের নায়ক ছিল স্নেলিঞ্জার।

স্নেলিঞ্জার সত্তর সমেত চার বার (৫৮,৬২, ৬৬ ও ৭০) ওয়ার্ল্ড কাপ খেলেছে। প্রতিবারই পঃ জার্মানির পক্ষে। আবার কেউ যদি ওকে ইতালির খেলোয়াড় বলে ভাবে তা হলেও দোষ দেওয়া যায় না। বাষট্টিতে এফ. সি কোলনকে লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ পাওয়ায় সাহায্য করেই ইতালির লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপে স্নেলিঞ্জার খেলেছে এ.সি. মিলানের রক্ষণভাগে। আটষট্টিতে, মিলান ক্লাব সেবার লীগে, শীর্ষ সম্মানও পেয়েছে। আটষট্টি-উনসত্তরে খেলেছে মিলানের ইউরোপীয়ান কাপ বিজয়ী একাদশেও। এবং ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়নশিপের (৬৯) খেলায় স্নেলিঞ্জার ছিল মিলানের প্লেয়ার, এত সব বাঁধিয়ে রাখার দৃষ্টান্তগুলিকে বৃত্তাকারে সাজিয়ে মাঝখানে কি রাখব এই চিন্তাতে স্নেলিঞ্জারের হয়তো সময় খরচ করতে হবে না কেননা ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তেষট্টিতে অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশে খেলার গৌরব দৃষ্টান্তও রয়েছে স্নেলিঞ্জারের মুঠোয়।

সত্তরের বিশ্ব কাপের পরে মাঠের এই সদা ব্যস্ত ফুটবলারটির বয়স হয়েছে বত্রিশ। চুয়াত্তরে স্নেলিঞ্জারকে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলাতে নামতে হবে না হয়তো। তাই ওকে বেঁচে থাকতে হবে অতীত নিয়ে?

অভিজ্ঞ ফুটবলার অ্যালবার্ট সেসতারনেভ

মেক্সিকো ওয়ার্ল্ডকাপে রাশিয়ান টিমের দল পরিচালনায় এবং রক্ষণভাগের মুখ্য চরিত্রে যিনি সবল রূপদান করেছিলেন—তিনিই অ্যালবার্ট সেসতারনেভ। নবম ওয়ার্ল্ডকাপের সময় ওর বয়স চলছিল আঠাশের গণ্ডিতে। তখন পর্যন্ত রাশিয়ান টিমে অ্যালবার্ট খেলেছেন বারো বছর ধরে। দলনায়ক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন পঁয়ষট্টি সাল থেকে। সামরিক জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত সেসতারনেভের আচরণে অপরের উপরে আধিপত্য বিস্তারের ইচ্ছাটি যেমন প্রবল, তেমনি ফুটবলের মাঠে কিভাবে প্রতিপক্ষের উপর প্রভাব খাটাতে হয় সে জ্ঞানও ওঁর নখদর্পনে। এজন্যে নাছোড়বান্দা ডিফেণ্ডার হিসাবে সেসতারনেভ যেমন নাম কিনেছেন, একই পথে দলের খেলোয়াড়দের উপরও ওঁর প্রাধান্য বর্তেছে। তা'বলে স্বেচ্ছাচারিতা কথাটা ওর সম্পর্কে আদৌ খাটে না। বরঞ্চ ওর দলের খেলোয়াড়রা ওর উপরে যেমন অগাধ বিশ্বাস রেখে চলে সেসতারনেভও তার প্রতিদানে নিজের ব্যবহারে প্রতিটি প্লেয়ারের উপর অগাধ বিশ্বাস ছড়িয়ে দিয়েছে।

মেক্সিকোর ওয়ার্ল্ডকাপে রাশিয়ান টিমে সবচেয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন খেলোয়াড়টিও ওই সেসতারনেভ। এই অভিজ্ঞতা বলে সেসতারনেভ ছেষট্টির ওয়ার্ল্ডকাপেও রাশিয়ান দলে অধিনায়ক হওয়ার সুযোগটি পেয়েছিল। বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয়, একজন ফুটবল সাংবাদিক যিনি অষ্টম ও নবম ওয়ার্ল্ডকাপে দুবারই রাশিয়ান টিমের খেলা দেখেছেন তিনি মন্তব্য রাখেন—সেসতারনেভের দক্ষতা ছেষট্টিতে যা ছিল তার সঙ্গে বাড়তি অভিজ্ঞতার যোগ হওয়ায় সত্তরের ওয়ার্ল্ডকাপে সেসতারনেভের মধ্যে অসাধারণ ডিফেণ্ডারের পরিচয় পাওয়া গেছে। এজন্যই বোধ হয় রাশিয়ার বৃদ্ধ কোচ গ্যাভরিল ক্যাশালিন বলেছেন—সেসতারনেভের মত এক নম্বর ডিফেণ্ডার রাশিয়ান ফুটবলে খুব কমই চোখে পড়েছে।

এক কথায় সেসতারনেভ—দক্ষ সুইপার। কথাটাকে ভেঙে বললে—

সে দরকার মত নিখুত পাস দিতে পারে বা মাটি ছেড়ে লাফিয়ে বলের মোকাবিলা করতেও পটু। আরও উল্লেখ্য—সেসতারনেভ একজন ভাল অ্যাথলীট। মাত্র ১১.১ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার দৌড়নোর ক্ষমতাও সেসতারনেভের কাছে সহজ ব্যাপার। মোট কথা এই ফৌজী ফুটবলারটি তার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীকে খেলার মাঠেই ছড়িয়ে রেখেছে। ভাল কথা, ওর জীবন সঙ্গিনী তাতানিয়া ঝুকও স্কেটিংয়ের বিশ্ব ও ইয়োরোপীয়ান চ্যামপিয়নশিপে সুনামের অধিকারিনী।

পাক্কা পেশাদার ফুটবলার ববি মুর

ইতিহাসের পাতায় লেখা হবে—সত্তরে ওয়ার্ল্ডকাপ ফুটবলে কোন অশান্তি ছিল না। একটি খেলোয়াড়কেও মাঠ হতে বের করা হয়নি। কিন্তু মাঠের বাইরের ঘটনা? এই জিজ্ঞাসাটা যদি ইংল্যাণ্ড দল নায়ক ববি মুরের সামনে রাখা হয়,—তখন? ববি বেশ অস্বোয়াস্তিতে পড়বে। বগোটায় ব্রেসলেট চুরির বৃতান্তে ওই ছিল নায়ক। এইখানেই চুপ করে যাচ্ছি কারণ নির্বিবাদী ফুটবল প্রেমীর কাছে এই প্রকার আউট অফ ফুটবল আলোচনা হয়তো সহ্য হবে না।

সহ্য না হওয়ারই কথা কারণ ববি মুর বগোটার কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে নিজের সুনামে কালি ঢাললেও তাকে ওয়ার্ল্ডকাপের খেলায় একবারও উদ্বিগ্ন বলে মনে হয়নি। এই জন্যেই ববি মুরের মানসিকতাকে সেলাম ঠুকতে ইচ্ছা করে।

ববি তার আঠাশ বছরের বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে মাঠে নেমে সামনে ধেয়ে আসা যাবতীয় প্রতিপক্ষের আক্রমণের জট খুলেছে। সেই এক ভঙ্গিতে অনবদ্য সহজ খেলা। ওর ছ ফুট বিরাশি কেজি ওজনের দেহটা যেরকমভাবেই হোক না কেন দক্ষতার পরীক্ষায় পাশ করেছে। সমস্ত কঠিন পরিস্থিতিকে সহজ ভাবে নেওয়ার রীতিটা ফুটবল পাঠের প্রথম

ভাগ থেকেই ও মুখস্থ করে রেখেছে। এই কাজে ওর পারদর্শিতা জেনে ববি যে দলেই খেলেছে—সেই দলে ওর অধিনায়কত্বে কেউ ভাগ বসানোর সুযোগ পায়নি।

সতের বছর বয়স হতে ইংল্যাণ্ডের যুব টিমে আঠার বার, চারশোরও বেশিবার ওয়েস্ট হ্যামের পক্ষে, তেইশ বছরের কম বয়সী ইংল্যাণ্ড টিমে আটবার, এছাড়াও ইংল্যাণ্ডের ফুটবল ইজ্জত রক্ষার্থে ববি মুর সত্তর পর্যন্ত খেলেছে প্রায় আশি বারেরও বেশি। ইংল্যাণ্ডের টিমে শিরোমণির পদ পেয়েছে সেই তেষট্টিতে। ববি এফ. এ এবং ইউরোপীয়ান কাপ বিজয়ের মেডেলও গলায় ঝুলিয়েছে। তাই পুরো পেশাদারী ফুটবলার হিসাবে ববি মুর অদ্বিতীয়। আঠাশ বছরের অল্প সময়ে এতটা অসাধ্য সাধন ববির পক্ষে কি ভাবে সম্ভব হয়েছে সেটাই জিজ্ঞাস্য। সহজেই সে উত্তর দিতে পারে—এ তো সহজ ব্যাপার। এমনি সহজ জবাব সে ওয়ার্ল্ডকাপের পরেও দিয়েছে—আমাদের সবাইয়ের ক্ষণিকের ভুলে আমরা মেক্সিকোয় ভাল ফলাফল রাখতে পারিনি।

———

ব্রাজিলের 'স্পার্ক প্লাগ' গার্সন নুনেস

মেক্সিকোর ওয়ার্ল্ডকাপে তিন নম্বর গ্রুপে ইংল্যাণ্ড ও ব্রাজিল মুখোমুখি হবার আগে ব্রাজিলের গার্সন নুনেসের উপর ইংল্যাণ্ডের ক্রীড়া সাংবাদিকরা মতামত রেখেছিলেন—উনত্রিশ বছর বয়সী গার্সন ব্রাজিল টিমের মিডফিল্ড পজিসনের এক নম্বর প্লেয়ার। বাঁ পায়ের সুন্দর কাজ, জোরালো ট্যাকল করার তাগদ এবং নিজেদের প্লেয়ারের কাছে বল পাঠানোর নির্ভুল ক্ষমতায় গার্সন ছিল ব্রাজিল টিমের অমূল্য সম্পদ।

কিন্তু ইংল্যাণ্ডের মিডফিল্ডের প্লেয়ার অ্যালান বল ওই খেলাটির আগে যা বলেছিল তাতে গার্সনের কোন প্রশস্তি ছিল না। গার্সন হঠাৎ নিজের জায়গা ছেড়ে প্রতিপক্ষের গোলের মুখে চলে যায়—এই দুঃসাহসী স্বভাবটা অ্যালান বলের ভাল লাগেনি।

গার্সন সম্বন্ধে জ্যাকি চার্লটনকে জিজ্ঞেস করা হলে সে জোরের সঙ্গে বলে—"আমার মতে গার্সন ব্রাজিলের বেস্ট প্লেয়ার। পেলে ধারে কাছে থাকলে গার্সনের ফুটবল বুদ্ধির সমস্ত কাজকারবার বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়াও বল নিয়ে নড়াচড়াতেও নতুন কিছু করতে যাচ্ছে এই সম্ভাবনার ছাপটাও বজায় থাকে।" জ্যাকিও এই কথাগুলো বলেছিল ওই ইংল্যাণ্ড বনাম ব্রাজিলের মহা-সাক্ষাৎকারের আগে।

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে নেহাতই সৌভাগ্যের বিষয়, ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে গার্সন ওই ম্যাচটিতে খেলতে পারেনি কারণ সে আহত ছিল। যদি খেলত তবে গার্সন নিশ্চিত ভাবে অ্যালান বলকে টের পাইয়ে দিত সে কত বড় প্লেয়ার। ফলে ইংল্যাণ্ডের সাংবাদিক মহল ও জ্যাকি চার্লটনের কথার গুরুত্ব বোঝা যেত, এতৎসত্ত্বেও বলতে বাধা নেই—গার্সন পরে সুস্থ হয়ে ফাইনাল পর্যন্ত যা খেলেছে তাতে, অ্যালান বল নিশ্চয়ই তার উক্তিটি প্রত্যাহার করে নিয়েছে, অবশ্যই আন্তরিকভাবে।

গুয়াদালাজারা ও মেক্সিকো সিটিতে সকলেই জেনে গেছে গার্সনের কিকের গুরুত্ব। আবার বলছি ওর বাঁ পা'টা একটা অস্ত্রের মত ব্যবহৃত হয়। ওই পায়ের জোর ও নিশ্চয়তা অতুলনীয়। গ্রুপ ম্যাচে চেকের সঙ্গে প্রথম খেলায়—ওর পাশ থেকে বল পেয়েই পেলে ও জেয়ারজিনহো গোল করতে পেরেছে। একবার চেক টিমের প্লেয়ারদের হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে হল, এই সময় গার্সন ত্রিশ গজ দূর থেকে অবিশ্বাস্য সোয়ার্ভ করা শট্ করে। বল হাওয়ায় বাঁক নিয়ে স্থানুবৎ দাঁড়ানো গোলকীপারের ডান দিকের পোস্টে গিয়ে লাগে।

ব্রাজিলের ফাইনাল খেলা পর্যন্তও নুনেস ওই ভাবে টিমকে সাহায্য করেছে, বিশেষ করে পেলেকে। উনত্রিশ বছর বয়সী গার্সন ফুটবলের

রক্ষণ ও আক্রমণের খুঁটিনাটি এত আয়ত্ত করেছে যে পেলের মত বিজ্ঞ ফুটবলারের সঙ্গে ওর বোঝাপড়া অব্যর্থভাবে কাজ করেছে। পেলের নানা রকমের বিপজ্জনক আক্রমণ রচনাতে ৫ ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি উচ্চতার গার্সন সাহায্য করে সাক্ষাৎ স্যাঙাতের মত। এই জন্যেই ব্রাজিল টিমে বাহাত্তর কেজি ওজনের গার্সনের আর এক নাম—স্পার্ক প্লাগ। ব্রাজিল টিমে পেলের পরেই গার্সন দ্বিতীয় অভিজ্ঞ ফুটবলার।

মাঠের মধ্যে গার্সনের সদা সচল ভাবটা অনুধাবন করায় যদি কেউ অসুবিধা বোধ করে তবে সে ব্রাজিল টিম যখন ট্রেনিং নেবে তখন নজর রাখলে দেখতে পাবে বল আটকাতে ব্যস্ত গোলকীপারকে গার্সন তুমাতুম বল মেরে প্র্যাকটিশ দিচ্ছে—এতো দূর থেকে দেখা। খুব কাছ থেকে—চোখে পড়বে গার্সন এক রাজ্যের দাড়ি নিয়েই মাঠে হাজির। প্র্যাকটিশের সময়ও হাতে জ্বলন্ত সিগারেট (দোহাই বাংলা দেশের ফুটবলাররা গার্সনের এই অভ্যাসটিকে নকল করবেন না যেন)। গার্সন দিনে ৪০ টার বেশি সিগারেট খায়। কিন্তু খেলার মাঠে ওকে কখনো দম হারাতে দেখা যায়নি।

———

পেরুর সেরা খেলোয়াড় শ্যুমপিতাজ

মার খেয়ে মার দেবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে পেরু টিম মেক্সিকোর ওয়ার্ল্ডকাপে নেমেছিল। প্রতিজ্ঞাটা বেদমন্ত্রের মত অনুসরণ করে পেরু টিম ওয়ার্ল্ডকাপে খেলেওছে। এবং এই প্রানবন্ত খেলার জন্যেই পেরু কোচ ডিডি আত্মনির্ভরতায় ভবিষ্যত বাণী করেছিল, "পেরু ব্রাজিলকেও হারিয়ে দিতে পারে।" যাদের খেলার উপর বিশ্বাস রেখে ওই কথাগুলো ডিডি নির্ভয়ে আওড়েছিল তাদের মধ্যে ডিফেণ্ডার হেক্টর শ্যুমপিতাজও একজন।

আরও বাড়িয়ে বললেও ক্ষতি নেই, কোচ ডিডি রেখেছিল

শ্যুমপিতাজের উপর বিরাট প্রত্যাশা। শ্যুমপিতাজও তার দায়িত্ব ছাড়াও টিমের ধমণীতে বাড়তি উৎসাহ দিতেও হয়েছে যত্নবান। আর এজন্যেই ওর উপর পেরু টিম পরিচালনার ভার চাপানো হয়।

এই গুরুভার মাথায় করে হেক্টর মেক্সিকোয় বেলজিয়ামের বিরূদ্ধে গ্রুপ ম্যাচে পিছিয়ে পড়া পেরুকে একটি গোলও উপহার দিয়েছে। এর আগে পেরু ১-২ গোলে হারছিল। দাদন শুধেই শ্যুমপিতাজ সামান্য রক্ষণাত্মক হয়ে উঠেছিল। কেন ওই ছাব্বিশ বছর বয়সী ফুটবলারটিকে রক্ষণ ভাগের নোঙ্গর বলা হয় তা ওই পরবর্তী মুহূর্ত্তগুলিতেই স্পষ্ট হয়েছে।

শ্যুমপিতাজের তৃতীয় গুণ ওর মত জোরালো শট্ দঃ আমেরিকার ফুটবলারদের কারোরই নেই। এই তৃতীয় অস্ত্রটি প্রয়োগে শ্যুমপিতাজ সব সময়ে রাজি নয়। একান্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখে না পড়লে শ্যুমপিতাজ ওর বজ্রসম শটের ভেলকি দেখায় না।

এ হেন সতর্ক সাবধানী ফুটবলারটির মধ্যে খেলোয়াড়চিত ব্যবহারের অভাব নেই। মাঠের বাইরে ওর সঙ্গে যারা মিশেছে তারা হেক্টরের অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ ও বিস্মিত।

তাই সর্বগুণমণ্ডিত ফুটবলারটির প্রশংসা শিরোপারও অভাব ঘটেনি। সত্তরের ওয়ার্ল্ডকাপ খেলার আগেই পেরুর ক্রীড়ামোদীরা ওকে ১৯৬৯ এর সেরা খেলোয়াড় হিসাবে মেনে নিয়েছে।

দুর্দমনীয় গতিশীল অ্যালান বল

ছেষট্টির ওয়ার্ল্ড কাপ টিমে ইংল্যাণ্ডের বয়োকনিষ্ঠ খেলোয়াড়টি ছিলেন মিডফিল্ড পজিসনের প্লেয়ার, অ্যালান বল। তখন তার বয়স হয়েছিল মাত্র কুড়ি। সত্তরের ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার আগে বলের চেহারায় রুক্ষ ভাব এসেছে। তেমনি তার উচ্চতা ইঞ্চি দুয়েক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ ফুট পৌনে সাত ইঞ্চি। দেহের ওজনেও হেরফের ঘটে দাঁড়ায় বাষট্টি কেজি। কিন্তু এই পরিবর্তনের সমীক্ষাটা তেমন লক্ষ্যনীয় নয়। বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয় ওর খেলার ধাঁচে চার বছরের মধ্যে এসেছিল আমূল পরিবর্তন।

এও বলা হয় এতটা পরিবর্তন নাকি ইংল্যাণ্ড দলের কোন খেলোয়াড়ের মধ্যে দেখা যায়নি। ছেষট্টিতে বলের সম্বন্ধে মন্তব্য রাখা হত বল অব ফায়ার। আর সেই মন্তব্যটা শুধরে নিয়ে নতুন বক্তব্য জুড়ে দেওয়া হয়—বল অব এনার্জি। তবে এ ব্যাপারটা সমস্তটাই ওর মেজাজ মাফিক।

কাঁচা বুদ্ধি নিয়ে ছেষট্টিতে বল যতক্ষণ মাঠে ছিল ততোক্ষণই তড়বড় করে সহজ সমস্যাকেও জটিল করে ফেলেছে কিন্তু সত্তরের অ্যাল্যান বল আবির্ভূত হয়েছে অন্য রূপে। ওকে আবোল তাবোল ড্রিবল করতে দেখা যায়নি বা পাশ দেওয়ার কাজগুলোয় বুদ্ধির ছাপ ফুটে উঠেছে। দ্রুতগতিতে এগোনোর সময় পাশ ফেরত দেওয়ার কাজেও বল ভুল করেছে কদাচিত। সব জড়িয়ে ইংল্যাণ্ড টিমে ওর মিডফিল্ডের দক্ষতা স্বীকৃতি পেয়েছে, ববি চার্লটনের পরবর্তী সংস্করণ হিসাবে।

প্রায় বড় প্লেয়ারের শুরুর দিনগুলি যেমন হেনস্থায় ভরা থাকে বলের ক্ষেত্রে তার ব্যত্তিক্রম ঘটেনি। উলভস ও বোল্টন ওয়াণ্ডারার্স থেকে প্রত্যাখ্যান পেলেও ব্ল্যাকপুল ওর প্রতিভাকে মেনে নিয়েছিল। তারপরে ইংল্যাণ্ড ম্যানেজার র‍্যামজে ওকে জোর করে ইংল্যাণ্ড টিমে নেওয়ায় সমালোচকরা র‍্যামজেকে ছেড়ে কথা বলেন নি।

ক্লাব জীবনে বল আবার জার্সি বদল করে এভার্টনে ঢুকেছে। এভার্টনে ওই ক্লাবের হ্যারি ক্যাটারিকের কথায় বল পেয়েছে এক লক্ষ বারো হাজার পাউণ্ড। এদিকে এভার্টনের সত্তরের লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মূলে অ্যালান বলের দানও কম নয়। ছেষট্টির ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালে বল জান লড়িয়ে ১২০ মিনিট খেলেছে। শেষ পনের মিনিটে ইংল্যাণ্ড টিমের উদ্যোগী পুরুষ বলতে একমাত্র বলকেই বোঝায়।

সেই হতেই বলের সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডের সাংবাদিকরা রেখেছে উচু ধারণা। মেক্সিকোতে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার আগে বলকে ব্রাজিলের সম্পর্কে কিছু কথা বলতে অনুরোধ করা হলে সে বলে, ব্রাজিলের ডিফেন্স যখন তখন ভেঙে পড়ে কিন্তু ওরা গোল খায়না—ব্যাপারটা বোঝা দায়। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন বিশেষত্ব আছে।

চেক টিমের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের খেলার উপমা খাড়া করতে বল মন্তব্য রেখেছে, ব্রাজিল বাস্কেটবলের কায়দায় ফুটবল খেলেছে, যেমনি ব্রাজিলিয়ানরা বল পেয়েছে অমনি আক্রমণ করার জন্য সাতটি প্লেয়ার এগিয়ে গেছে। তখন মিড ফিল্ড ফাঁকা। অথচ ইংল্যাণ্ডে মাঝ মাঠেই খেলার ফয়সালার উৎস মুখের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এর পরেই বল পেলের কথায় নেমে আসে, 'আমি পেলেকে কোনদিন বিস্মৃত হবনা।'

গ্যারিঞ্চার জোর দাবিদার জেয়ার

মেক্সিকোর মহারণের আগে তিন নম্বর গ্রুপের ব্রাজিল ও ইংল্যাণ্ড টিমের কে কেমন খেলবে এ নিয়ে উত্তেজনার অন্ত ছিল না। প্রথম খেলায় ইংল্যাণ্ড ১-০ গোলে রুমানিয়াকে হারানোর পরেই ব্রাজিলও চেক টিমকে ৪-১ গোলে হারায়। মাঝের সময়টুকুতে ইংল্যাণ্ড টিমে একটি দুশ্চিন্তা বারবার খুঁচিয়ে উঠেছে। ব্রাজিলের দক্ষিণ প্রান্তিক খেলোয়াড় জেয়ারকে আটকাতে ইংল্যাণ্ডের লেফটব্যাক টেরি কুপার সক্ষম হবে কি?

খেলা আরম্ভ হওয়ার কিছুক্ষণ বাদে এই দুশ্চিন্তাটি চাপা পড়েছে। ব্রাজিলের গোলের সামনেই বল বেশিবার ঘোরাফেরা করছিল। পরে ব্রাজিল কিছুটা সামলেও নিয়েছে। ইংল্যাণ্ড রক্ষণ ভাগ একটি মারাত্মক ভুল করে বসল। এতে কুপারও বাদ ছিল না।

খেলা তখন পাকা এক ঘণ্টায় পৌঁছেছে। তোস্তাও বাঁ দিক বরাবর বল ধরে মুহূর্তের ঝটকায় ইংল্যাণ্ড ডিফেন্সকে ভুল পথে ফেলেই সমস্ত খেলোয়াড়কে জড়ো করে দিয়েছে একধারে। বল গেছে পেলের পায়ে। পেলে নিজে না মেরে বলটা জেয়ারকে দিয়েছে। পলকের মধ্যে বলটি চলে গেছে গোলের মধ্যে। ব্যাঙ্কস হতবুদ্ধি ও পরাজিত। ওইখান থেকেই ইংল্যাণ্ডের ভাগ্যের উপর পরাজয়ের সীলমোহর পড়েছে।

এতো বললাম জেয়ারের হাতে ইংল্যাণ্ডের ইস্পাত দৃঢ় ডিফেন্সের তছনছ হওয়ার কাহিনী। আসলে জেয়ার সত্তরের ওয়ার্ল্ড কাপে কোন রক্ষণ প্রাচীরকেই কঠিন বলে ভাবেনি। ফাইনাল পর্যন্ত কুড়িয়ে বাড়িয়ে মেক্সিকোয় ব্রাজিল গোল করেছে পনেরটি। এতে জেয়ারজিনহোর দান ৭টি। সর্বোচ্চ সংখ্যক গোলকারীদের তালিকায় মুলারের ১০টি গোলের পরেই জেয়ারের ৭ টি গোল ওকে দ্বিতীয় স্থান পাওয়ায়

সাহায্য করেছে। জেয়ারের এতে ক্ষুব্ধ না হওয়াই উচিত কারণ সব কটি ম্যাচে গোল করার সৌভাগ্য ওই সাতটি গোলেই সম্পন্ন হয়েছে। যা সত্তরের ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার সময় পর্যন্ত একমাত্র জেয়ার ছাড়া আর কারোর পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

ব্রাজিল টিমের মেক্সিকো বিজয়ের আগে ভাবিষ্যতবাণী ছিল পেলে, জেয়ার, গার্সন, এডু ও তোস্তাও এই পাঁচজন মিলে এমন পাঁচমিশেলী আক্রমণ হানবে যা প্রতিটি টিমের কাছে ভয়ের কারণ হবে। জেয়ারজিনহোর (জেয়ার ভেঞ্চুরা ফিলহো) ভূমিকায় বলা চলে ওই পাঁচজনের মধ্যে সে প্রথম জন।

কিন্তু পেলে ও তোস্তাওয়ের মত নামী খেলোয়াড় ব্রাজিল টিমে থাকায় ওই পঁচিশ বছুর বয়সী পাঁচ ফুট সওয়া আট ইঞ্চি উচ্চতার ও বাহাত্তর কেজি ওজনের ফরোয়ার্ডটির দিকে কেউ তাকাতে ফুরসত পায়নি। নিজের ক্লাব বোটা ফোগোতেও জেয়ারকে তার স্বভাবসিদ্ধ পজিসন সেণ্টার ফরোয়ার্ড থেকে সরে এসে রাইট উইংয়ের দায়িত্ব নিতে হয়েছে—যে দায়িত্ব ওর আগে ব্রাজিলের বিখ্যাত রাইট উইং গ্যারিঞ্চার উপর ন্যস্ত ছিল।

এতে জেয়ারের ভালই হয়েছে। সে বল পেলেই নিজের তীব্র গতিতে নির্ভর করে জায়গা পাল্টে প্রতিপক্ষের রক্ষণ ব্যূহের মাঝ খান দিয়ে ফুঁড়ে ঢুকে পড়ে। যদি জেয়ার দেখে যে তার টিমের ফরোয়ার্ড লাইনে কেউ জায়গা ছেড়ে পাশে দাঁড়িয়েছে, সে জায়গাতেও জেয়ার নিজেকে ফিট করে নেয়।

ত্বরিতগতি জোয়ারের মূলধন। এর সঙ্গে জেয়ার আবার ড্রিবলিং পারঙ্গমও বটে। বল পেলে নিঃস্বার্থভাবে দলের প্লেয়ারদের সাহায্য করা যেমন জেয়ারের এক বিশেষ গুণ তেমনি প্লেয়ারদের ভিড় থেকে নিজেকে ফাঁকায় রাখার ব্যবহার—ওর সহজাত পরিধির মধ্যে পড়ে। এইসব মিলে মিশে ব্রাজিলটিমে জেয়ার গ্যারিঞ্চার অভাব অনেকটা পূরণ করেছে।

মেক্সিকোর বিশ্ব ফুটবল সমরের আগে জেয়ারকে ব্রাজিলের ছদ্মবেশী ফরোয়ার্ড বলে ভাবা হয়েছিল। পরে দ্বিমত করার উপায় নেই—জোয়ারই পূর্ণ প্রভায় উদ্ভাসিত।

মূল্যবান ফুটবলার মুলার

নিছক ব্যবসাদারের দৃষ্টিতে বলতে হয়, সত্তরের ওয়ার্ল্ড কাপে সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় ছিলেন—পঃ জার্মানির জারড মুলার। যে কোন ফুটবল ম্যাচে গোল করাটাই যদি একমাত্র বিষয়বস্তু হয় তবে আমার উপরের কথাটা মিথ্যা কি ?

মেক্সিকোর বিশ্ব কাপ ফুটবল শেষে কোন ফুটবলার কটি গোল করেছে এর তালিকায়—জারডের নাম সবার উপরে। এজন্যে গর্ব থাকলেও, তার একমাত্র দুঃখ মাত্র তিনটি গোল কম হওয়ায় মুলার ফ্রান্সের ফরোয়ার্ড জাঁতে ফঁত্যার রেকর্ড 'তেরটি' গোল করার কৃতিত্ব ছুঁতে পারেনি। মুলারের দ্বিতীয় দুঃখ, পেরুর বিরুদ্ধে তার তিনটি গোল যদি পরপর করা সম্ভব হত তবে হাঙ্গেরির (১৯৫৪) স্যাণ্ডর কোজিসের ডবল হ্যাটট্রিকের গৌরবটিকেও অপদস্থ করতে পারত। গ্রুপ ম্যাচে তার প্রথম ও একমাত্র হ্যাটট্রিকটি ছিল বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে।

মেক্সিকোতে মুলারের গ্রুপ ম্যাচগুলোর অর্জিত গোল সংখ্যা ছিল—সাত। মেক্সিকোর ফাইনাল পর্যায়ে দুমাদুম অত গুলো গোল করার হিড়িক দেখে বাধ্য হয়েছি, ওর খেলা প্রাক কোয়ালিফাইং ম্যাচের হিসাবের দিকে চোখ রাখতে। বলতে দ্বিধা নেই ওখানেও মুলার অদ্বিতীয়।

কোয়ালিফাইং ম্যাচের জার্মানির মোট ২০টি গোলের মধ্যে মুলারের

দান ৯টি। সাইপ্রাসের বিপক্ষে কোয়ালিফাইং ম্যাচে পঃ জার্মানি জিতেছিল ওই মুলারেরই দেওয়া গোলে।

অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তখন খেলা শেষ হতে দুমিনিট বাকি। মুলার শেষবারের মত কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে অষ্ট্রিয়ার গোলে বল মেরেছে—এবং এই একমাত্র গোলই পঃ জার্মানিকে জিতিয়েছে। মুলার ওই গোল করে যে কতবড় কাজ করে তা অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফিরতি ম্যাচের ফলাফলই বলে দেয়। কারণ—মুলার ওই ম্যাচে গোল করেনি তাই পঃ জার্মানিকে ড্র করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

শত বাধা সত্ত্বেও স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলায় মুলারের একক প্রচেষ্টার একমাত্র গোলটি পঃ জার্মানিকে এগিয়ে দিলে তা শুধতে স্কটল্যাণ্ডকে দস্তুরমত কসরত করতে হয়েছে। অতঃপর বলা যেতে পারে মুলারের গোল—ক্ষুধার তীব্রতা প্রমানিত।

ফুটবল মহলে ওর ডাক নাম 'দের বোম্বার'। এই গাঁট্টা গোঁট্টা চেহারার ফরোয়ার্ডটি পঃ জার্মানির বিখ্যাত ফুটবলার বেকেনবোয়ারের ক্লাব বেয়ার্ন ম্যুনিখের হয়ে খেলে। ওর চেহারায় একমাত্র দোষ, একটু বেশি থলথলে। এজন্যে অনেক ফুটবল গণতকার ভবিষ্যতবাণী রেখেছিলেন "তুমি যা মোটা তাতে ফুটবলার হওয়া তোমার কপালে নেই।" বলা বাহুল্য জারড বেশ ভোজনবিলাসীও।

তবে এই ভারি চেহারার ফরোয়ার্ডটির পায়ে বল পড়লেই আর রক্ষে নেই। তার কাছ থেকে কে বল ছিনিয়ে নেবে এটাই হয় তখন একমাত্র সমস্যা। মুলার কৃত গোলগুলি তেমন নয়ন লোভন না হলেও, বেশিসংখ্যক খেলোয়াড়দের জটলায় ওর বল কণ্ট্রোল ও সবল ভঙ্গির প্রকাশই এর নীট ফল। এই কারণেই রক্ষণ-ভাগের প্লেয়ার, মুলারকে মারাত্মক মনে করে। এবং সে নিজ গুণে যে কোন জায়গা থেকে গোল করতে সক্ষম।

পঃ জার্মানির জাতীয় দলে মুলারের প্রবেশ কিছুটা ধূমকেতু উদয়ের মতই। বটসিয়া ডর্টমুণ্ডের হয়ে ফেডারেল লীগে

মুলার টপ স্কোরার হলেও ওয়ার্ল্ডকাপ খেলার জন্যে পঃ জার্মানির যে চল্লিশজনের নাম করা হয়েছিল তাতে জার্ডের নাম ছিল না। মুলারের জন্যই বেয়ার্নের পক্ষে ইউরোপীয়ান কাপ জেতা সম্ভব হয়েছিল। এইসব গুণপনার খাতিরে মুলার যেদিন থেকে পঃ জার্মানির টিমে খেলছে সেই সময়টুক হল মাত্র তিন বছর। মেক্সিকোয় খেলার আগে পর্যন্ত মুলার পঃ জার্মানির জার্সি গায়ে ১৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে গোল করেছিল সতেরটি।

তাই সন্দেহ জাগে বার বার গোলের অ্যাকাউন্ট বাড়ানোর জন্যেই কি ওকে পঃ জার্মানির সেরা স্পোর্টসম্যান বলা হয়েছে—কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। মুলার এই শিরোপা পেয়েছে তার ফেয়ার ফুটবল, এবং খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের গুণে।

সোনার বুট পায়ে গিগি রিভা

সর্বাধুনিক পদ্ধতির ফুটবলে এক বা দুজন খেলোয়াড়ের চেয়ে সংঘবদ্ধভাবে সারা টিমকে এক বা একাধিক খেলোয়াড় আক্রমণ ও আত্মরক্ষার চেষ্টাই নাকি শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই পদ্ধতিকে একমাত্র ভেবে উদাহরণসরূপ বলা হয়, ব্রাজিলের ছেষট্টির ওয়ার্ল্ডকাপে হারার কারণ তারা শুধুমাত্র পেলেকে কেন্দ্র করেই সাফল্যের হিসাব কষেছিল। কিন্তু পেলের উপর প্রতিপক্ষের প্লেয়াররা এত কড়া নজর রাখে যে সে ভগ্নমনোরথ হওয়ায় ব্রাজিলকেও ছেষট্টির বিশ্বকাপ ফুটবল যুদ্ধ থেকে ফিরে আসতে হয়।

কথাটি মনে রেখে মেক্সিকোর ওয়ার্ল্ডকাপ চলার সময়ে একজন সাংবাদিক ইতালির কোচ ভ্যালক্যারেগিকে জিজ্ঞাসা করেন আচ্ছা, লুইগি রিভাই তো আপনার টিমের সবচেয়ে দামি এবং বুদ্ধিমান

ফুটবলার। ভ্যালক্যারেগির উত্তর—হ্যাঁ। তাহলে আশা করব রিভাকে কেন্দ্রমণি করেই আপনি ইতালি টিমের পরিকল্পনা ফেঁদেছেন—সাংবাদিক জানালেন।

তৎক্ষণাৎ ভ্যালক্যারেগি সাংবাদিকের প্রত্যাশাকে অস্বীকার করে বলেন—রিভার স্ট্রাইকিংয়ের অসামান্য ক্ষমতা ধরে নিয়েও আমি ওই ধরণের ভুল করতে রাজি নই।

রিভার উপর সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে সে তা বহন করতে পারবে কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিইনি এতে রিভাকে আটকে দিলেই আমাদের ফন্দিটন্দি সব ভেস্তে যাবে। এজন্যে ওরই ক্লাব ক্যাগিলিয়ারির প্লেয়ার বনিনসেগনাকে ওর পাশে রেখে ওকে দায় মুক্ত করার চেষ্টা হবে। তবে সবাই ওর উপর নির্ভর করলে রিভা কখন সখন ঘাবড়েও যায়। সেজন্যেই ওর মুখ চেয়ে আক্রমণ চালানোর মতলবে যাইনি।

কিন্তু ভ্যালক্যারেগি মুখে যতই বলুন না খেলার সময় উনি রিভাকে নিয়েই ইতালি টিমের আক্রমণ জাল বুনেছেন। এতে ইতালি লাভবান হয়েছে। মেক্সিকোয় আসার আগে ইতালি টিমের আশা ছিল—বড় জোর সেমিফাইনাল পর্যন্ত তাদের পক্ষে ওঠা সম্ভব। কিন্তু ফাইনালে যাওয়ার পথে রিভা প্রতিপক্ষ ফুটবলারদের কাছ থেকে সর্বদা গুঁতোগুঁতি, জার্সি টেনে ধরা ও অন্যান্য আঘাতের তিক্ত স্বাদ নিয়েও ইতালিকে ছেষট্টির অগৌরবের (উঃ কোরিয়ার হাতে হঠাৎ হার) পাঁক থেকে টেনে তুলেছে।

সত্তরের ওয়ার্ল্ডকাপ ফাইনাল পর্বে রিভা ছটি খেলায় গোল করেছিল ৩টি। এই গোলের অঙ্কে বিচার করলে, রিভার সঠিক ফুটবল ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে না। লুইগি (ডাক নাম 'গিগি') রিভার পাশে বনিনসেগনা শিয়রুগি ও বার্গনান প্রমুখ খেলোয়াড় যারা ওর চারধারে হাজির থেকে ইতালির আক্রমণের শক্তি জুগিয়েছে তাদের পরিষ্কার স্বীকৃতি বলছে—রিভা বিনা ইতালির টিম নিস্তেজ।

রিভার শক্তিমত্তা কৌশল ও চাতুর্যের সংমিশ্রণ, সম্ভবতঃ এজন্যেই

রিভা পৃথিবীর বহুল পরিচিত অ্যাথলীটদের অন্যতম গোল লক্ষ্যভেদী। এতে ওর সুনামের সঙ্গে অর্থপ্রাপ্তি ঘটতেও বাকি থাকেনি। রিভা এক সিজন খেললে প্রণামী পায় দেড় কোটি টাকা। পঁচিশ বছর বয়েসেই এই পেয়েছে। খেলা রাখতে পারলে ওর কদর আরও কত হবে কে জানে।

তৃতীয় ডিভিসনের লেগনানো ক্লাব থেকে বড় ক্লাব কাগিলিয়ারি পর্যন্ত এই ন' বছরে রিভাকে নিয়ে কত টাকার খেলা চলেছে সে গল্পের স্তূপও বিরাট। কিন্তু রিভাকে ও নিয়ে গল্প বলানো খুব শক্ত। অহমিকার ছোঁয়াচ ওর কথায় থাকে না বললেই চলে। সদাই একা থাকতে ভালবাসে, নিজেকে নিয়ে অযথা ঢাক পিটুনিতেও রিভার মত নেই।

মেক্সিকো হতে রিভার খেলার ধাঁচ নিয়ে প্রচুর সুমন্তব্য ভেসে এসেছে, তবু আমার ঘোরতর সন্দেহ রিভা মেক্সিকোতে তার মনের মত খেলা দেখাতে পারেনি। অন্তরায় হয়েছিল প্রতিপক্ষ প্লেয়ারদের বেয়াদবি আচরণ। রিভা যেখানেই গেছে তার পিছনে দু-তিনজন বিপক্ষের প্লেয়ার গোয়েন্দার মত পিছু নিয়েছে। রিভা বলেছে, আমি বল নিয়ে পেরিয়ে যাব ওরা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবে এটা যেমন হয় না, তেমনি আমার দিক থেকেও যুক্তি ওরা আমায় বাধা দিক, আশা করব সেই বাধাদানে ভদ্রলোক ফুটবলারের আচরণ থাকবে। মেক্সিকোতে রিভার সে প্রত্যাশা চুরমার হয়ে গেছে।

নবম ওয়ার্ল্ড কাপের দর্শকরাও রিভার সহজাত নিপুনতা দেখতে না পেয়ে ভীষণরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জিওফ হার্স্টের জোরালো ক্ষমতা, ববি চার্লটনের দক্ষতা ও জিমি গ্রিভসের অব্যর্থ গোল নিশানা যে রিভার মধ্যে একযোগে মিশেছে তা মেক্সিকোর বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠানের দর্শকরা দেখতে পায়নি। এবং রিভা মাত্র তিনটি গোল করে দেশে ফিরলেও ইতালির ফুটবল দর্শক "সোনার বুট পরা" গোলের মালাকার রিভাকে কখনো বর্জন করবে

না। সত্তরের ওয়ার্ল্ডকাপের প্রাথমিক পর্বের খেলায় রিভা ওয়েলসের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করায় ইতালিতে ওর জনপ্রিয়তা আকাশ ছুঁয়েছিল —রিভা যতদিন বাঁচবে ওখান থেকে তাকে কেউই টেনে নামাতে পারবে না।'

শুধু ইতালির দর্শক কেন, বিশ্ব ফুটবল রঙ্গমঞ্চ থেকেও পেলের মত প্রতিভা সরে যাওয়ার খবর শুনে যারা হায় হায় করে উঠেছে তারাও রিভার খেলায় এতটা মুগ্ধ যে, নিঃসঙ্কোচে বলেছে, রিভার বর্ণচ্ছটা পেলেকেও নিষ্প্রভ করবে।

———

পরিশ্রমী বুদ্ধিমান তিওফিলো কুবিল্লাস

এশিয়ার ফুটবল প্রতিনিধি উঃ কোরিয়ার ফুটবল টিম অষ্টম ওয়ার্ল্ড-কাপে সকলকে তাক লাগিয়েছিল তাদের বিশুদ্ধ ফুটবল খেলা দেখিয়ে। নবম ওয়ার্ল্ডকাপের ফাইনাল পর্যায়ের খেলার আগেও কেউই জোর করে বলতে পারেনি, কোন টিম সত্তরের ওয়ার্ল্ডকাপে ওই উঃ কোরিয়ার অনুরূপ কৃতিত্ব রাখতে পারবে। আর যে কোন টিমের সম্বন্ধে আশা করা হোক বা না হোক, পেরু টিমের সম্বন্ধে কোন ফুটবল পণ্ডিতই ভরসা পায়নি। এতে পেরু টিমের কিছু যায় আসেনি। পেরুর প্লেয়াররা তাদের কোচ ডিডির ফুটবল বুদ্ধি অনুযায়ী 'আক্রমনাত্মক' খেলায় মেতে সকলের সুনাম পেয়েছে। পেরুর মরীয়া ঢঙের প্ল্যানে নেতৃত্ব দিয়েছিল একত্রিশ বছর বয়সী স্ট্রাইকার তিওফিলো কুবিল্লাস।

ওর উচ্চতা মাত্র ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি। দেহের ভার ৭২ কেজি। কুবিল্লাসের এতসব দেহ তথ্য হাজির করলাম কারণ ওর ওই শরীরের নমনীয়তাই পেরুর প্রতিপক্ষকে বিভ্রমে ফেলেছে। কুবিল্লাস সুযোগ অনুযায়ী

পরের পর গোল করেছে। মেক্সিকোতে তিওফিলোর অর্জিত গোল সংখ্যা ছিল—৫। ওই দক্ষদায় কুবিল্লাস মেক্সিকোর সর্বোচ্চ গোলকারীদের তালিকায় হয়েছে তৃতীয়। ফাইনাল পর্বের চারটি খেলায় কুবিল্লাস ওই গোলের অঙ্কটি গড়েছে। অথচ পেলে ৬ টি খেলায় করেছে চারটি। অঙ্কের তুলনামূলক হিসাবের দিক থেকে প্রসঙ্গটি নিশ্চয় বেখাপ্পা হবে না কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্য উদাহরণ—কুবিল্লাস সত্তরের ওয়ার্ল্ড কাপের প্রাথমিক পর্বে তিনটি ম্যাচ খেলে গোল করেছিল মাত্র একটি।

কুবিল্লাসের কথায় ওর পাশাপাশি তুই সতীর্থ লিওন ও বেললনের কথা এসে পড়া স্বাভাবিক। মেক্সিকোর পেরু টিমের আক্রমণ ভঙ্গির প্রসঙ্গে ওই 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' নাম করে বলা হয়েছে ওরা হল 'স্ট্রাইকি ট্রায়ো'। ব্যক্তিগত গুণের বাচবিচার করতে গিয়ে লিওন সম্বন্ধে বলা হয়েছে, লিওন মাথা গরম ফুটবলার। বল, প্লেয়ার ও পোক্ত ড্রিবলারের খ্যাতি পেয়েছে বেলন। কিন্তু তিনটি বিশেষণে ভূষিত হয়েছে কুবিল্লাস। পরিশ্রমী, মেধাবী ও আক্রমণাধিনায়ক। পেরুর অ্যালিয়াঞ্জা লিমা ক্লাবের কুবিল্লাসের গোল করার ক্ষমতাকে পাছে কেউ ভুল ভাবে, এজন্যে এও বলা হয়—উচ্চতায় ও ওজনে কিছু কমতি হলেও কুবিল্লাস গোলের পাহাড় গড়তে অনবদ্য ওস্তাদ।

———